POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

وَلَقَدِ اسۡتُهۡزِئَ بِرُسُلٍ مِّنۡ قَبۡلِكَ
فَحَاقَ بِالَّذِيۡنَ سَخِرُوۡا مِنۡهُمۡ مَّا
كَانُوۡا بِهٖ يَسۡتَهۡزِءُوۡنَ

এবং তোমার পূর্বেও রসূলগণকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হইয়াছে, ফলে তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা হাসি-বিদ্রূপ করিয়াছিল তাহাদিগকে উহাই পরিবেষ্টন করিয়াছিল যাহা লইয়া তাহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত।

(আল আনআম: ১১)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدۡ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 9

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly **BADAR** Qadian Bangla

সংখ্যা 34

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 22 Aug, 2024 16 সফর 1445 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহর কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

কেউ যখন কোন হিবা বা উপহার দেওয়ার অঙ্গীকার করে এবং তা পূর্ণ করার পূর্বেই মৃত্যু বরণ করে

২৫৯৮) হযরত জাবির (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সা.) আমাকে বলতেন: যদি বাহারীন থেকে সম্পদ আসে তবে তোমাকে এই এই সম্পদ দিব। তিনি একথা তিন বার বলেন। সেই সম্পদ যখন আসে তখন রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর মৃত্যু হয়েছিল। হযরত আবু বকর (রা.) একজন ঘোষণাকারীকে আদেশ দিলে সে ঘোষণা করল যে, নবী (সা.) এর পক্ষ থেকে যদি কারো সঙ্গে কোন অঙ্গীকার বা ঋণ থেকে থাকে তবে সে ব্যক্তি চাইলে আমার কাছে আসুক। আমি তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, নবী (সা.) আমাকে কথা দিয়েছিলেন যে, হযরত আবু বকর আমাকে তিন ধামা ভর্তি করে (সম্পদ) দেন।

ডানদিকে থাকা ব্যক্তির গুরুত্ব

২৬০২) হযরত সাহাল বিন সাআদ (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সা.) এর নিকট কোন পানীয় দ্রব্য নিয়ে আসা হয়। তিনি (সা.) সেটা পান করেন। তাঁর ডান দিকে একটি ছেলে বসে ছিল আর তাঁর বাম দিকে প্রবীণ সাহাবাগণ। তিনি ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি আমাকে অনুমতি দাও যাতে আমি তাদেরকে দিতে পারি। সে বলল: হে রসুলুল্লাহ্ (সা.)! আপনার থেকে যে অংশ আমি পেয়েছি তা আমি অন্য কাউকে দিতে চাই না।' একথা শুনে আঁ হযরত (সা.) সেই ছেলেটির হাতে পেয়ালাটি তুলে দেন।

(বুখারী, কিতাবুল হিবা)

এই সংখ্যায়

খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ১২ই জুলাই ২০২৪

হুযুর আনোয়ার (আই.) এর অনলাইন সাক্ষাত ও ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক প্রশ্নোত্তর।

আমাকে একজন স্বর্গীয় সত্তা হিসেবে গ্রহণ করে দেখ, মুসলমানদের মধ্যেকার যাবতীয় বিবাদ ও বিতর্ক নিমেষে দূর হয়ে যাবে।

আমার কাছে এস, আমার কথা শোন, যাতে তোমরা সত্য দেখতে পাও। আমি অন্ধকারের সকল আবরণ খুলে ফেলতে চাই। আন্তরিকভাবে তওবা করে মোমেন হয়ে যাও।

আমিই সেই আধ্যাত্মিক নেতা, তোমরা যার আগমণের প্রতীক্ষায় আছ। তোমরা আমার কাছ থেকে এর প্রমাণ নাও।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র বাণী

আমার মর্যাদা একজন সাধারণ মৌলবী সদৃশ নয়। বরং আমার মর্যাদা আম্বিয়া সদৃশ। আমাকে একজন স্বর্গীয় সত্তা হিসেবে গ্রহণ করে দেখ, মুসলমানদের মধ্যেকার যাবতীয় বিবাদ ও বিতর্ক নিমেষে দূর হয়ে যাবে। যে খোদার পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট হয়ে ন্যায় বিচারক হয়ে এসেছে, সে কুরআন করীমের যে অর্থ ও ব্যাখ্যা করবে সেটাই সঠিক হবে আর যে হাদীসকে সঠিক বলে আখ্যায়িত করবে সেটিই সঠিক হাদীস হবে। অন্যথায় আজও দেখ, শিয়া-সুন্নীর বিবাদের নিষ্পত্তি হওয়ার কোন লক্ষণ নেই। .... আমি বলছি, যতদিন পর্যন্ত না এরা নিজেদের পথ ত্যাগ করে এই বিষয়গুলিকে আমার বোধগম্যতা অনুসারে না দেখবে, তারা কখনই সত্য পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। এরা যদি এখনও বিশ্বাস না করে,তবে তাদের এতটুকু নিশ্চয় উপলব্ধি করা উচিত যে তাদেরকে একদিন অবশ্যই মরতে হবে আর মৃত্যুর পর অপবিত্রতা কখনও নাজাতের দিকে নিয়ে যেতে পারে না। একজন সৎ প্রকৃতির মানুষ যেখানে অশ্লীল ও আক্রমণাত্মক ভাষা পছন্দ করে না, সেখানে পবিত্র খোদার নিকট এমন অপরাধে দুষ্ট ব্যক্তিদের ইবাদত কিভাবে গৃহীত হতে পারে? এজন্য আমি বলি, আমার কাছে এস, আমার কথা শোন, যাতে তোমরা সত্য দেখতে পাও। আমি অন্ধকারের সকল আবরণ খুলে ফেলতে চাই। আন্তরিকভাবে তওবা করে মোমেন হয়ে যাও। আমি ঘোষণা করছি যে, আমিই সেই আধ্যাত্মিক নেতা, তোমরা যার আগমণের প্রতীক্ষায় আছ। তোমরা আমার কাছ থেকে এর প্রমাণ নাও। আমি এমন দাবিকে যথাযথ ও সম্মানের বলে মনে করি না যে, হযরত আলী (রা.) আঁ হযরত (সা.)-এর অব্যবহিত পরেই খলীফা ছিলেন। এমন জঘন্য আপত্তির আমি কিই বা উত্তর দিব? এই সকল অপবিত্রদের অপসারণের উদ্দেশ্যেই তো খোদা তা'লা আমাকে প্রেরণ করেছেন।

দেখ, সুন্নী তাদের হাদীসগুলিকে অসমর্থিত বলে দাবি করে। পক্ষান্তরে শিয়ারা দাবি করে যে, তাদের হাদীসগুলিকে নিরবিচ্ছিন্ন বর্ণনায় সরাসরি আঁ হযরত (সা.) পর্যন্ত অনুসরণ করা যায় এবং এই হাদীসগুলি ইসলামের ইমামগণ উদ্ধৃত করেছেন। আমার মতে এই সব ঝগড়া বিবাদ অনর্থক। এখন এই অকেজো যুক্তিগুলিকে পাশে সরিয়ে রাখ এবং সেই জীবিত ইমামকে সনাক্ত কর যাতে তোমাদের মাঝে জীবনের আত্মা সঞ্চারিত হয়। যদি তোমরা খোদার সন্ধানে থাক তবে সেই ব্যক্তিকে সন্ধান কর যাকে যে খোদার পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট হয়ে এসেছে। যদি কোন ব্যক্তি অপবিত্র জীবন ত্যাগ না করে তবে জেনে রেখো, আমি অন্ধ নই। আমি কি মুনাফিকের হৃদয়ের দুর্গন্ধ অনুভব করি না? আমি মুহূর্তের মধ্যে এক ব্যক্তিকে মেপে নিতে পারি যে, তার কথার মধ্যে কোন কপটতা লুকিয়ে আছে। অতএব, স্মরণ রেখো! খোদা তা'লা এই পথই পছন্দ করেছেন যেটা আমি বর্ণনা করেছি আর এই নিকটতম পথটি তিনিই বের করেছেন। দেখ, যে ব্যক্তি রেলের মত আরামদায়ক যানবাহন ছেড়ে একটা খোঁড়া ও নিস্তেজ টাট্টু ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়, সে কি কখনও নিজের গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে? দুঃখের বিষয় এই যে, এরা খোদার কথায় কর্ণপাত না করে অন্যের কথায় প্রাণপাত করে। তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর যে, এই হাদীসগুলি কে দিয়েছে?

আমি বার বার একথাই বলি যে, আমার পথ হল, আরও একবার নতুন করে মুসলমান হও। অতঃপর আল্লাহ তা'লা স্বয়ং প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করে দিবেন। আমি সত্য সত্য বলছি, যে ইমামগণের প্রতি তারা এমন ভক্তি ও ভালবাসায় আপ্লুত, যদি তাঁরা জীবিত থাকতেন, তবে এদের থেকে তাঁরা কঠোরভাবে বিমুখ হতেন।

আমি যখন এমন লোকদের থেকে বিমুখ হই,তখন তারা বলে, আমরা এমন কি আপত্তি করলাম যার উত্তর এল না। অনেক সময় আবার ইশতেহার দিয়ে বেড়ায়। কিন্তু আমি এমন বিষয়ের কি-ই বা পরোয়া করতে পারি। আমি সেটাই করব যেটা আমার কাজ।

তাই স্মরণ রেখো, অতীতের খিলাফতের বিবাদ ত্যাগ কর, এখন নতুন খিলাফতকে গ্রহণ কর। এক জীবিত আলী তোমাদের মাঝে বিদ্যমান। তাকে ছেড়ে মৃত আলীকে সন্ধান কর?

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৫)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

মৌলিক ধর্মতত্ত্ব ও এর খুঁটিনাটি

পুরুষরা নিজেরাই ইকামত বলবে আর এমনিতেও ইকামত সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রয়োজনে ইমাম নিজেও ইকামত বলতে পারে। বাড়িতে নামায হলেও মেয়েরা ইকামত বলবে না। কেননা হুযুর (সা.)-এর অনুমতি প্রদান করেন নি।

একজন তিফল প্রশ্ন করে যে, অনেক সময় বড়রা বলে থাকেন যে, ছোটদের দোয়া বেশি কবুল হয়। প্রিয় হুযুর! আমাদেরকে এই বিষয়টি আরও বিস্তারিত বোঝাবেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন, শিশুরা যেহেতু নিষ্পাপ হয়ে থাকে। তাই বলা হয় আর একটি হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে, যেহেতু শিশুরা নিষ্পাপ তাই তাদের দোয়া বেশি শোনা হয়। আর যে সমস্ত বড়দের দ্বারা বেশি পাপ সংঘটিত হয় বা নিয়ম মত নামায পড়ে না এবং জাগতিক বিষয়াদিতে বেশি মনোযোগি এবং আল্লাহ্ তা'লার সাথে নিজেদের দায়িত্বাবলীর প্রতি সুবিচার করে না- এমন ব্যক্তিরা তখনই দোয়া করে যখন তাদের কোন কিছুর প্রয়োজন হয়।কিন্তু শিশুরা জাগতিক বিষয়াদিতে বেশি মগ্ন থাকে না। তারা এই বয়সে নিষ্পাপ হয়ে থাকে। তাই এই বয়সে তারা যখন দোয়া করে, তখন আল্লাহ্ তা'লা তাদের পাপমুক্ত হওয়ার কারণে বেশি করে দোয়া শোনেন। কেননা এই দোয়া তাদের হৃদয় থেকে বের হয় আর আল্লাহ্ তা'লা নিষ্পাপ মানুষদে পছন্দ করেন। আর যারা অনেক মুত্তাকি হয়ে থাকেন তারাও নিষ্পাপ হয়ে থাকেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরও দোয়া শোনেন। কিন্তু আমরা প্রায় দেখি যে, মানুষ জাগতিক বিষয়াদিতে বেশি লিপ্ত থাকে। পক্ষান্তরে শিশুরা জাগতিক বিষয়াদি খুব বেশি বোঝে না, সেই কারণে তারা নিষ্পাপ হয়ে থাকে। তাদের দ্বারা পাপ সংঘটিত হয় না। এই জন্য আল্লাহ্ তা'লা তাদের দোয়া বেশি শোনেন।

আরও এক তিফল প্রশ্ন করে যে, প্রিয় হুযুর! অত্ম-অহংকার ও আত্মবিশ্বাসের মধ্যে পার্থক্য কি? বিষয়টি স্পষ্ট করবেন আর আমরা কিভাবে আত্ম-অহংকার থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারি?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনি কি জানেন, আত্ম-অহংকার কি? (তিফল উত্তরে বলে, আত্ম-অহংকার হল এক প্রকার বেশি আত্ম বিশ্বাসী হয়ে ওঠা।) বেশি আত্মবিশ্বাসের অর্থ আত্ম-অহংকার নয়। অহংকারের অর্থ হল যেমন- তুমি যা কিছু করছ তা সঠিক আর অন্যরা যা করছে তা ভুল। নিজেকে সঠিক বলা ভুল নয়, বরং অপররের মতামতকে সহন না করা এবং অন্যায়ভাবে তার সঙ্গে বিতণ্ডায় লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। আর যদি তুমি কেবল নিজেকে সঠিক মনে কর তবে তা আত্ম-অহংকার। পক্ষান্তরে আত্মবিশ্বাস বলতে বোঝায়- যেমন তুমি যদি যা কিছু কথা বল তা সাক্ষ্য প্রমাণসহকারে বল। যদি তুমি মনে কর যে, যা কিছু তুমি বলছ সে সম্পর্কে তোমার কাছে প্রমাণ আছে আর সেই প্রমাণ তুমি উপস্থাপন করতে পার আর অন্যরা তোমার সেই প্রমাণ মেনে নিতে পারে, তবে সেটা হল আত্ম বিশ্বাস। কিন্তু তুমি যদি কারো সাথে তর্ক কর আর তোমার যুক্তি-প্রমাণ ভুল প্রমাণিত হয় আর লোকে তোমার কথা না মানে আর তুমি রাগান্বিত হয়ে ওঠ এবং কলহ শুরু করে দাও তবে সেটা অহংকার। আত্মবিশ্বাস থাকা উচিত আর এর জন্য তোমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করতে হবে। কিন্তু অনেক সময় অহংকারী ব্যক্তিদের জ্ঞান থাকে না, তবুও তারা মনে করে যে তারা সঠিক বলছে। এমন ব্যক্তি যাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস আছে, তাদের কাছে নিজদের যুক্তি প্রমাণ করার জন্য জ্ঞান থাকে।সেই যুক্তিপ্রমাণগুলি কেউ গ্রহণ করুক বা না করুক, তোমাদের জানা থাকে যে, তোমরা এই বিষয়টি নিয়ে ভাল করে জান। তাই তাদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক না করে আপনি কেবল তাদের এতটুকু বলে দিন যে, বেশ, তুমি যা বলছ সেটাই ঠিক। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)ও বর্ণনা করেছেন এক বাদশাহর কাহিনী, যে কি না নিজের হাতে কুরআন করীম লিখত। একবার এক বিদ্বান ব্যক্তি তার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আসে।সে লিখিত আকারে কুরআন করীমকে দেখে বাদশাহকে বলল, তুমি এই শব্দটি সঠিক লেখ নি। একথা শুনে বাদশাহকে সেই শব্দটিকে বৃত্তাকার করে ঘিরে দেয়। সেই বিদ্বান ব্যক্তি চলে যাওয়ার পর বাদশাহ সেই বৃত্তটি মুছে দেয়। বাদশাহর কাছে বসে থাকা লোকেরা বলল, আপনি কেন বৃত্ত বানিয়ে মুছে ফেললেন। বাদশাহ বলল, আমি এই শব্দটি সঠিক লিখেছি, কিন্তু সেই আলেমের মনে হল সে ঠিক বলছে, তাই আমি সেই শব্দটিকে বৃত্ত দিয়ে ঘিরে দিই, বিতর্ক করি নি যাতে সেও খুশি হয়, তাই আমি শব্দটিকে চিহ্নিত করেছিলাম। অহংকার না দেখিয়ে বাদশাহ উচ্চ মানের বিনয় প্রদর্শন করেছে। বাদশাহ হওয়া সত্ত্বেও আত্মবিশ্বাস প্রদর্শন করে নি। আর সেই বাদশাহ এটাও দেখিয়েছে যে আমরা কিভাবে আত্ম-অহংকার থেকে রক্ষা পেতে পারি।

প্রশ্ন: আমরা কিভাবে হাসিখুশি থাকতে পারি?

হুযুর আনোয়ার (আই.) সেই তিফলকে জিজ্ঞাসা করেন যে তা বয়স কত? (তিফলটি উত্তর দেয় তার বয়স নয় বছর) হুযুরর আনোয়ার বলেন, আপনার সব সময় আশ্বস্ত ও শান্ত চিত্ত থাকা উচিত। সব সময় একথা চিন্তা করবে যে, আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে এমন অনেক কিছু দান করেছেন। অনেক জাগতিক উপকরণ দান করেছেন। আপনাকে সুন্দর চেহারা দান করেছেন, আপনাকে দৃষ্টি শক্তি দান করেছেন। আল্লাহ তা'লাআপনাকে মুখ ও জিহ্বা দান করেছেন যার মাধ্যমে আপনি সুন্দর সুন্দর কথা বলতে পারেন। আপনার আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত। এছাড়াও আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে আরও অনেক জাগতিক উপায় উপকরণ দান করেছেন যাতে আপনি স্কুলে যেতে পারেন এবং নিজেকে সুশিক্ষিত করে তুলতে পারেন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে যোগ্য পিতামাতা দান করেছেন এবং ভাই-বোন দান করেছেন-এই বিষয়গুলিও আপনাকে আনন্দিত করে। (হুযুর আনোয়ার জানতে চান যে, তার কোন ভাই আছে কি না। তিফল উত্তর দেয়, তার দুইজন ছোট ভাই আছে) হুযুর আনোয়ার বলেন,তারা আপনার সঙ্গে ভাল আচরণ না করলেও আপনি সব সময় আনন্দিত থাকবেন আর আল্লাহ্ ত'লার নিকট কৃতজ্ঞ থাকবেন,যিনি আপনাকে অসংখ্য নেয়ামত দান করেছেন। দেখ,এই জগতে অসংখ্য মানুষ আছেন,যারা জীবনের মৌলিক সুযোগ সুবিধা থেকেও বঞ্চিত। তারা বেঁচে থাকার জন্য পর্যাপ্ত খাবার পর্যন্ত পায় না। তারা স্কুল যাওয়ার সুযোগ পায় না। অনেক সময় তারা পুকুরের দুষিত পানি পান করতে বাধ্য হয়। আর আপনারা তো বোতলবন্দী বা ট্যাপের পরিষ্কার পানি পান করেন। তাই আপনি যদি ভেবে দেখেন যে আল্লাহ তা'লা আপনাদের কত কিছু দান করেছেন, তবে আপনি অবশ্যই আনন্দিত হবেন। আর আপনি যদি আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ হন তবে আল্লাহ তা'লা আপনাকে আনন্দিত রাখবেন। সব সময় তাদেরকে দেখা উচিত যারা মৌলিক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। পক্ষান্তরে আপনাদের জন্য সমস্ত প্রকারে সুযোগ সুবিধা রয়েছে। এই কারণে আঁ হযরত (সা.) এর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি (সা.) বলেছেন, যখন ধর্ম,তাকওয়া এবং পুণ্যের বিষয় আসে, তখন সব সময় সেই সব লোকদের দেখ যারা তোমাদের থেকে উত্তম। আর যখন জাগতিক বিষয়ের প্রসঙ্গ আসে তখন সব সময় সেই সব লোকদের দেখ যারা তোমাদের চায়তে নিকৃষ্ট জীবন যাপন করছে। এমন মানুষ যারা আপনাদের থেকে অনেক কম সুযোগ সুবিধা ভোগ করে। এই বিষয়টি আপনাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ করে তুলবে আর তোমরা আনন্দিত থাকবে।

এক তিফল নিবেদন করে যে, তারা সারা দিনের স্কুল ও অন্যান্য কাজকর্ম প্রায় ইলেকট্রনিক ডিভাইস এর মাধ্যমেই হয়ে থাকে। তার প্রশ্ন হল, স্ক্রীন টাইমে কিভাবে ভারসাম্য বজায় রাখা যেতে পারে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনাকে এ বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে যে, আপনার চোখের উপর যেন বেশি চাপ না পড়ে। আপনি যদি ইলেকট্রনিক ডিভাইস এবং ট্যাবলেট ও সেলফোনে স্কুলের কাজ করে থাকেন, তবে টিভিতে বা অন্য কোন অনুষ্ঠান দেখার জন্য বেশি সময়ের জন্য ট্যাবলেট বা ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহার করা উচিত নয়। অন্যথায় আপনার স্বাস্থ্য ও চোখের প্রতি অবিচার করা হবে। তাই নিজের উপর অতিরিক্ত বোঝা চাপাবেন না আর চোখের উপরও বেশি চাপ দিবেন না। (ক্রমশ......)

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা একথা ভুলে যেও না যে, খোদা তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহ ব্যতিরেকে তোমরা আদৌ জীবিত থাকতে পার না।

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬২৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam, Nararvita (Assam)

জুমআর খুতবা

বনু মুস্তালিক এর পরিস্থিতি এবং ঘটনাবলীর বর্ণনা

মহরমের এই দিনগুলিতে দরূদ শরীফ ও দোয়া করার উপদেশ

বনু মুস্তালিক গোত্রের নেতা হারিস বিন আবি জারার তার জাতি ও এবং আরববাসীকে আঁ হযরত (সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে এবং মদিনা থেকে প্রায় ছিয়ানব্বয় মাইল দূরত্বে একটি স্থানে সেনা সমাবেশ ঘটাতে শুরু করে।

বনু মুস্তালিক যুদ্ধের দিন মুসলমানদের সংকেত বাণী ছিল 'ইয়া মনসুর, আমিত, আমিত।

বর্তমানে আহমদীদেরকে দরূদ শরীফ পাঠ করার এবং এবং মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতির জন্য বিশেষ দোয়ার প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত। নিজেদের অবস্থার উন্নতির জন্য এবং আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করার প্রতিও আমাদের বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত।

মাননীয় বোঙ্গা মাহমুদ সাহেব শহীদ (টোগো), মাননীয় রশীদ আহমদ সাহেব সাবেক সহকারী নাজির উমুরে আমা, মাননীয় চৌধরী মুতিউর রহমান সাহেব নায়েব নাজির উমুরে আমা, মাননীয় মাহমুদ আহমদ ভট্টি সাহেবের স্ত্রী মাননীয় মঞ্জুর বেগম সাহেব এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.)-এর দেহরক্ষী মাননীয় খুশি মহম্মদ সাহেবের পুত্র মাস্টার সাআদত আহমদ আশরাফ সাহেবের স্মৃতিচারণ ও জানাযা গায়েব।

সৈয়্যেদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ১২ জুলাই, ২০২৪, এর জুমুআর খুতবা (১২ ওফা, ১৪০৩ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,আজ গযওয়ায়ে বনু মুস্তালিক বা মুরাইসী'র যুদ্ধাভিযানের ঘটনা বর্ণনা করব। এই গযওয়া সংঘটিত হওয়ার সময়কাল সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আল্লামা ইবনে ইসহাক, তাবারী ও ইবনে হিশামের মতে বনু মুস্তলাকি এর যুদ্ধ ৬ষ্ঠ হিজরীর শাবান মাসে সংঘটিত হয়েছিল।

(আসসীরাতুন নববীয়াত, ইবনে ইসহাক, পৃ: ৪৩৯) (তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ১০৯)

কারও কারও মতে ৫ম হিজরীতে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন।

(তাবাকাতুল কুবরা, লি ইবনে সাআদ, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৮) (কিতাবুল মাগাযি লিল ওয়াকিদি,১ম খণ্ড,পৃ: ৩৪১)

সহীহ বুখারীতে মুসা বিন আকবার পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, বনু মুস্তালিক এর যুদ্ধ ৪র্থ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল। তবে বুখারীর ব্যাখ্যাকারী আল্লামা ইবনে হিজর আসকালানী লেখেন, এটা লেখার বিচ্যুতি। তিনি ৫ হিজরী লিখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ৪ হিজরী লেখা হয়েছে।

(ফতহুল বারী, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৪৩০)

এই যুদ্ধ সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবও নিজের গবেষণা কর্ম তুল ধরেছেন। তিনি বলেন,বনু মুস্তালিক এর যুদ্ধ ৫ম হিজরীর শাবান মাসে সংঘটিত হয়েছিল। (সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৫৫৭)

যেহেতু বনু খুযা'আ গোত্রের একটি শাখা বনু মুস্তালিকের সাথে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল বলে এর নামগযওয়ায়ে বনু মুস্তালিক রাখা হয়েছে। এছাড়া এ গোত্রটি মুরাইসী নামক একটি কূপের নিকটে বসবাসকরত, সেহেতু এই যুদ্ধের অপর নাম হল গযওয়ায়ে মুরাইসী। মুরাইসী মদিনা থেকে প্রায় একশ আট মাইল দূরত্বে অবস্থিত।

(তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড,পৃ: ৪৮) (উর্দু অভিধান, খণ্ড-১৭, পৃ: ৭৭৩)

বনু মুস্তালিক গোত্র কুরাইশের সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিল আর কুরাইশরা তাদের কাছ থেকে এ অঙ্গীকারনিয়েছিল যে, তারা কুরাইশের সাথে একাত্ম হয়ে থাকবে। এই কারণে তাদেরকে 'আহাবিশু' বলা হত আর এই চুক্তি অনুসারে তারা কুরাইশের সাথে উহুদের যুদ্ধেও অংশ নিয়েছিল।

(সীরাতুল হালবিয়া,২য় খণ্ড,পৃ: ২৯৭)

বনু মুস্তালিকের যুদ্ধের একটি কারণ হল, বনু মুস্তালিক ইসলামের শত্রুতায় দুঃসাহসিকতা প্রদর্শন করেছিল এবং ক্রমশ তারা অগ্রসর হচ্ছিল। তাদের প্রতি কাফের কুরাইশদের পূর্ণ সহায়তা ও সমর্থন ছিল। মুসলমানদের বিরুদ্ধে উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণের কারণে তারা প্রকাশ্যে মুসলমানদের বিরোধিতা করতে শুরু করে এবং তাদের ঔদ্ধত্য প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় কারণ হল, মক্কা থেকে যাতায়াতের রাজপথে বনু মুস্তালিকের নিয়ন্ত্রণ ছিল। তাই এরা মক্কায় মুসলমানদের কর্তৃত্ব প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে শক্তিশালী প্রতিবন্ধকতার ভূমিকা রাখত।

(মারবিয়াতে গাযওয়ায়ে বনী মুস্তালিক, প্রণেতা-ইব্রাহিম বিন ইব্রাহিম, পৃ: ৮৯)

তৃতীয় কারণ হল, বনু মুস্তালিকের নেতা হারিস বিন আবী যিরার নিজের জাতি ও আরববাসীকে মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত করে এবং মদীনা থেকে প্রায় ৯৬ মাইল দূরবতী এক স্থানে সৈন্য সমাবেশ করতে আরম্ভ করে। (সুবুল হুদা ওয়ার রিশাদ,৪র্থ খণ্ড,পৃ: ৩৪৪)

হযরত মির্যা বশীর আহ্মদ সাহেব (রা.) 'সীরাত খাতামান্নবীঈন' পুস্তকে এ সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে, "কুরাইশদের বিরোধিতা দিনের পর দিন আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠছিল। তারা তাদেরনৈরাজ্য দ্বারা আরবের বহু গোত্রকে ইসলাম ও ইসলামের প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান করিয়েছিল,কিন্তু সেই মুহূর্তে তাদের শত্রুতা এক নতুন বিপদ সৃষ্টি করেছিল যে, হিজাজের যে সকল গোত্রমুসলমানদের সঙ্গে সুসম্পর্কে আবদ্ধ ছিল তারাও কুরাইশদের বিদ্রোহের কারণে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মাথা চাড়া দিতে শুরু করে। এ বিষয়ে বনু খুযা'আ গোত্রের একটি শাখা বনু মুস্তালিক অগ্রণী ভূমিকা নেয় এবং মদীনায় আক্রমণের প্রস্তুতি শুরু করে। তাদের নেতা হারিস বিন আবি যিরার এই অঞ্চলের অন্যান্য গোত্রকেও তার সাথে যোগদান করায়।"

(সীরাত খাতামান্নবীঈন, পৃ: ৫৫৭)

মহানবী (সা.) বনু মুস্তালিক এর এই প্রস্তুতি সম্পর্কে অবগত হয়ে প্রথমে সতকর্তাস্বরূপ একজন সাহাবী হযরত বুরাইদাহ্বিন হুসায়েব (রা.)-কে খবরাখবর সংগ্রহের জন্য বনু মুস্তালিকের এলাকায় প্রেরণ করেন। তিনি সংবাদ নিয়ে ফেরত আসেন এবং তাদের ঝর্ণার কাছে গিয়ে মিলিত হন। বুরাইদা এক বিশ্বাসঘাতক জাতিকে দেখতে পান,যারা কেবল নিজেরাই একত্রিত হয়নি, বরং আশপাশের লোকজনের সেনাকেও একত্রিত করে রেখেছিল।তারা হযরত বুরাইদার কাছে তাঁর পরিচয় জানতে চান। হযরত বুরাইদা বলেন, আমি তোমাদেরই একজন। আমি তোমাদের সেনা সমাবেশের সংবাদ পেয়ে এখানে এসেছি। এইভাবে তিনি সুকৌশলে তাদের রণকৌশল ও প্রস্তুতি সম্পর্কে অনুমান নিয়ে আঁ হযরত (সা.) এর সমীপে উপস্থিত হন এবং তাদের অবস্থান সম্পর্কে অবহিত করেন। অতঃপর মহানবী

(সা.) মুসলমানদেরকে ডেকে শত্রুদের পরিকল্পনা সম্পর্কে সংবাদ দেন। ইসলামী সেনাবাহিনী দ্রুত যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে রওনা দেয়।

তাঁর (সা.) রওনা দেওয়ার বিস্তারিত বর্ণনাস্বরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, এক বর্ণনা অনুযায়ী তিনি (সা.) তাঁর অবর্তমানে হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.)-কে মদীনার আমীর নিযুক্ত করেন। ইবনে হিশাম আবু যার গাফ্ফারী (রা.)'র নাম বর্ণনা করেছেন, এমনই হযরত নুমাইলাহ বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.)'র নামও বর্ণিত হয়েছে। যাইহোক, মহানবী (সা.) ৭০০ সাহাবী সম্বলিত ইসলামী সেনাদল নিয়ে মুরাইসী অভিমুখে যাত্রা করেন। ৫ম হিজরির ২রা শাবান, সোমবার, মহানবী (সা.) মদিনা থেকে বনু মুস্তালিকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। হযরত মাসউদ বিন হুনাইদাহ (রা.) ছিলেন পথপ্রদর্শক। এই সফরে মুসলমানদের কাছে ত্রিশটি ঘোড়া ছিল,যার মধ্যে মুহাজিরদের কাছে দশটি ঘোড়া ছিল। হুযুর (সা.) এর দুটি ঘোড়া ছিল- লিজাজ ও জারিব। যে সকল মুহাজিরদের কাছে ঘোড়া ছিল তাদের নাম নিম্নে লিপিবদ্ধ হল।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) হযরত উমর ফারুক (রা.) হযরত মিকদাদ বিন আমর (রা.),হযরত উসমান গনী (রা.), হযরত আলী (রা.),হযরত জুবায়ের (রা.),হযরত হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ (রা.),হযরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহ্ (রা.),হযরত মিকদাদ বিন আমর (রা.)। আর আনসার সাহাবাদের মধ্যে ২০জন অশ্বারোহীর মধ্যে ১৫ জনের নাম পাওয়া যায়। যাঁরা হলেন- হযরত সাআদ বিন মাআজ,হযরত উসায়েদ বিন হুযায়ের (রা.),হযরত আবু আবাস বিন জাবার (রা.), হযরত কাতাদা বিন নুমআন (রা.), হযরত উইয়াবিম বিন সায়েদাহ (রা.), হযরত মাইনি বিন আদি (রা.), হযরত সাআদ বিন যায়েদ আশহালি (রা.),হযরত হারিস বিন হাযমা (রা.), হযরত মাআয বিন জাবাল (রা.),হযরত আবু কাতাদা (রা.), হযরত আবু আবি বিন কাআব (রা.),হযরত হুব্বাব বিন মুনজির (রা.), হযরত যিয়াদ বিন লাবিদ, (রা.), হযরত ফারওয়াহ বিন আমর (রা.),হযরত মুআজ বিন রিফাআ বিন রাফে (রা.)।

যাইহোক,এর বিস্তারিত বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, মহানবী (সা.) এর সঙ্গে বহু মুনাফিকরাও অংশগ্রহণ করেছিল। মূলত যুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রতি তাদের কোনো আগ্রহ ছিল না, বরং তাদের দৃষ্টি ছিল মালে গনিমতের প্রতি, যা যুদ্ধে জয় লাভ করার মাধ্যমে অর্জিত হবে আর তারা এর অংশ পাবে- এই লোভেই তারা যুদ্ধযাত্রায় অংশ নিয়েছিল।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৪র্থ খণ্ড,পৃ: ৩৪৪) (আল বাদাইয়া ওয়ান নিহাইয়াহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৬৯) (কিতাবুল মাগাযি, ১ম খণ্ড,পৃ: ৩৪১-৩৪৩) (আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৮২) (সীরাত এনসাইক্লোপেডিয়া, ৭ম খণ্ড,পৃ: ১৫৪)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ সাহেব (রা.) এ সম্পর্কে বর্ণনা করেন, "আঁ হযরত (সা.)যখন ঘটনার সংবাদ পেলেন, তিনি আরও বেশি সতর্কতা হিসেবে বুরাইদা বিন খুসাইব নামে এক সাহাবীকে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য বনু মুস্তালিক গোত্রের দিকে রওনা করেন এবং তাকে তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন ফিরে এসে বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁকে সংবাদ দেন" ঘটনা কি এবং বাস্তবতা কি ছিল- সে সম্পর্কে জানান। "বুরাইদা গিয়ে দেখেন সত্যিই অনেক মানুষের জমায়েত হয়েছে আর তারা পূর্ণ উদ্যমে মদিনা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তিনি অবিলম্বে ফিরে এসে আঁ হযরত (সা.) কে ঘটনা সম্পর্কে অবগত করেন এবং আঁ হযরত (সা.) রীতি অনুসারে মুসলমানদেরকে এগিয়ে রাখতে বনু মুস্তালিক এর বসতির দিকে রওনা হওয়ার নির্দেশ দেন।" তিনি (সা.) প্রথমে আক্রমণ করার পরিবর্তে তাদেরকে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। "অনেক সাহাবা তাঁর সঙ্গে রওনা হতে প্রস্তুত হয়ে গেল,বরং মুনাফেকদের একটি বড় দলও তাঁর সঙ্গে যোগ দিল, যারা এর পূর্বে কখনও এত বিপুল সংখ্যায় যোগ দেয় নি। আঁ হযরত (সা.) তাঁর অবর্তমানে আবু জার গাফফারী (রা.)কে কিম্বা কতিপয় রেওয়াত অনুসারে যায়েদ বিন হারসা কে মদিনার আমীর নিযুক্ত করে আল্লাহ্র নামসহকারে ৫ম হিজরীর শাআবান মাসে মদিনা থেকে রওনা হন। সেনাবাহিনীতে কেবল ত্রিশটি ঘোড়া ছিল। তবে উটের সংখ্যা বেশ কিছুটা বেশি ছিল আর এই ঘোড়া ও উটের উপরই মুসলমানেরা পালাক্রমে সওয়ার হয়ে যাত্রা করছিলেন।" (সীরাত খাতামান্নবীঈন, পৃ: ৫৫৭-৫৫৮)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ সাহেব (রা.) এ সম্পর্কে আরও বর্ণনা করেন." যাত্রাপথে মুসলমানরা এক কাফির গুপ্তচরকে পেয়ে যায়, তাকে ধরে তারা মহানবী (সা.)- এর কাছে নিয়ে আসেন। মহানবী (সা.) তদন্ত করার পর দেখেন, সে সত্যিই গুপ্তচর। প্রথমে তিনি (সা.) কাফিরদের ব্যাপারে তার কাছে কিছু সংবাদ জানতে চান, সে বলতে অস্বীকার করে, বরং তার আচরণ সন্দেহজনক ছিল তাই প্রচলিত রীতি ও রণনীতি মোতাবেক (সে যুগে যুদ্ধের যে নীতি ছিল) হযরত উমর (রা.) তাকে হত্যা করেন। অতঃপর সৈন্যদল পুনরায় বনু মুস্তালিকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

বনু মুস্তালিকের লোকেরা মুসলমানদের আগমণ ও তাদের গুপ্তচরের হত্যার সংবাদ পেয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। কেননা, তাদের অভিপ্রায় ছিল পূর্ণপ্রস্তুতি নিয়ে মদীনায় অতর্কিত আক্রমণ করা, কিন্তু মহানবী (সা.)-এর সতর্কতা, বিচক্ষণতা ও সুকৌশলের কারণে তাদের ষড়যন্ত্র ভেস্তে যায় এবং তারা কোণঠাসা হয়ে পড়ে এবং তাদের মনোবল ভেঙে যায়। এছাড়া তাদের সাথে অন্য যেসব গোত্র যোগ দিয়েছিল তারাও মুসলমানদেরকে দেখে ভীতিসন্ত্রস্ত হয়ে স্ব স্ব এলাকায় ফেরত চলে যায়। কিন্তু কুরাইশরা বনু মুস্তালিককে মুসলমানদেরপ্রতি শত্রুতার এমন নেশায় আসক্ত করেছিল যে, এমতাবস্থায়ও তারা যুদ্ধের অভিপ্রায় পরিহার করেনি এবং পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে ইসলামী সেনাদলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বদ্ধপরিকর হয়।"

(সীরাত খাতামান্নবীঈন, পৃ: ৫৫৭-৫৫৮)

মহানবী (সা.) মুরাইসী পৌঁছালে তাঁর জন্য চামড়ার তাঁবু লাগানো হয়। এ যুদ্ধাভিযানে মহানবী (সা.)-এর সহধর্মিনী হযরত আয়েশা (রা.)ও সহযাত্রী ছিলেন। কতিপয় ইতিহাসবিদ হযরত উম্মে সালামা (রা.) এর নামও উল্লেখ করেছেন, তাঁর সহধর্মিণীদের মধ্যে তিনিও হযরত আয়েশা (রা.) -এর সঙ্গে ছিলেন, কিন্তু আল্লামা ইবনে হিজর এমন রেওয়াতগুলিকে দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন যেখানে হযরত উম্মে সালামার সঙ্গে থাকার কথা উল্লেখ রয়েছে। তাঁর মতে,বুখারীর রেওয়াত অনুসারে হযরত আয়েশার মুখ নিঃসৃত কথা হল -'ফাখারাজা সাহমী'-অর্থাৎ আমার নামের চিরকুট বের হয়। এর থেকে জানা যায় যে, উক্ত যুদ্ধে আঁ হযরত (সা.)-এর পবিত্র সহধর্মিণীদের মধ্যে কেবল হযরত আয়েশার নাম এসেছিল, যিনি আঁ হযরত (সা.)-এর সঙ্গে গিয়েছিলেন।

(ফতহুল বারি, (ফয়জুল বারি, পারা-১৯, পৃ: ১৯৩)

এই যুদ্ধে মুসলমানদের সংকেত বাণী কি ছিল? ইবনে হিশাম লেখেন, বনু মুস্তালিকের যুদ্ধের দিন মুসলমানদের সংকেত বাণী ছিল- 'ইয়া মনসুর আমিত আমিত।'

এর অনুবাদ হল- হে সাহায্যপ্রাপ্ত! হত্যা কর, হত্যা কর। এই সংকেতবাণী ব্যবহারের প্রজ্ঞা এই ছিল যে, মুসলমান ও কাফেরদের মাঝে যেন কোন প্রকার বিভ্রম না থাকে। আর রাতের অন্ধকারেও মুসলমানেরা পরস্পরকে চিনতে পারে। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৫৮)

(মারবিয়াতে গাযওয়াহ বনী মুস্তালিক, প্রণেতা-ইব্রাহিম বিন ইব্রাহিম, পৃ: ১০৯) (আসসীরাতুন নববীয়্যত লি ইবনে হিশা,পৃ:৬৭৩)

এই যুদ্ধে মুসলমানদের মহানবী (সা.) সাহাবীদেরকে সারিবদ্ধ করে দাঁড় করান। মুহাজিরদের পতাকা হযরত আবু বকর (রা.) মতান্তরে হযরত আম্মার বিন ইয়াসের(রা.)'র হাতে এবং আনসারদের পতাকা হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা.)'র হাতে তুলে দিয়েছিলেন।তিনি (সা.) হযরত উমর (রা.)-কে নির্দেশ দেন, শত্রু বাহিনীর সামনে ঘোষণা কর যে, হে লোক সকল! বল, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং এর মাধ্যমে তোমরা তোমাদের প্রাণ ও সম্পদকে সুরক্ষিত করে নাও। হযরত উমর (রাঃ) তা-ই করলেন, কিন্তু মুশরিকরা অস্বীকার করে। কিছুক্ষণ পরস্পর প্রবল তির নিক্ষেপণ চলতে থাকে।

মুশরিকদের এক ব্যক্তি সর্বপ্রথম তির নিক্ষেপ করে। এর বিপরীতে মুসলমানরাও তির নিক্ষেপ করতে থাকে। অতঃপর মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে সাহাবীরা তাদের ওপর সম্মিলিতভাবে চড়াও হন। যার ফলে মুশরিকরা কোথাও আর পালানোর সুযোগ পায়নি। তাদের মধ্য থেকে ১০জন নিহত হয় আর অবশিষ্ট প্রত্যেককে বন্দি করা হয়। আর এভাবে তিনি (সা.) তাদের পুরুষ-মহিলা, সন্তান-সন্ততি ও পশুদেরকে বন্দি করেন।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৪৫)

হযরত মির্যা বশীর আহ্মদ সাহেব (রা.) তাঁর বর্ণনায় লিখেছেন, মহানবী (সা.) মুরাইসী পৌঁছে শিবির স্থাপনের নির্দেশ দেন। সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানো এবং পতাকা বিতরণের পর তাঁর (সা.)নির্দেশ অনুযায়ী হযরত উমর (রা.) বনু মুস্তালিকের মাঝে ঘোষণা করেন, যদি তারা এখন ইসলামের সাথে শত্রুতা পরিত্যাগ করে এবং মহানবী (সা.) এর নেতৃত্বকে মেনে নেয় তবে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ পরিহার করা হবে"। ধর্ম পরিবর্তনের কথা উল্লেখ নেই। আঁ হযরত (সা.)-এর নেতৃত্ব মেনে নিলে যুদ্ধ প্রত্যাহার করা হবে। "এবং মুসলমানরা ফিরে যাবে, কিন্তু তারা তা কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করে এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। এমনকি বর্ণিত আছে যে, এই যুদ্ধে তাদের লোকেরাই প্রথম তির নিক্ষেপ করেছিল। মহানবী(সা.) তাদের এই অবস্থা পর্যবেক্ষণের পর সাহাবাদের যুদ্ধের নির্দেশ দেন। কিছুক্ষণ পরস্পরের মধ্যে প্রবল তির নিক্ষেপণ চলতে থাকে। অতঃপর মহানবী (সা.) সাহাবাদের সম্মিলিতভাবে চড়াও হওয়ার নির্দেশ দেন। আর এই অতর্কিত আক্রমণের ফলে কাফেররা পিছু হটতে শুরু করে, কিন্তু মুসলমানরা এমন চতুরতার সাথে তাদেরকে ঘিরে ফেল যে, তাদের পুরো জাতি অবরুদ্ধ হয়ে আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। শুধুমাত্র দশজন কাফির ও একজন মুসলমান নিহত হওয়ার মাধ্যমে এ যুদ্ধ সমাপ্ত হয় যা এক ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করতে পারত।"

(সীরাত খাতামান্নবীঈন, পৃ: ৫৫৮-৫৫৯)

আজ একজন শহীদ ও কয়েকজন মরহুমের স্মৃতিচারণ করতে চাই, যে কারণে মূল খুতবা সংক্ষিপ্ত করছি। বর্তমানে আমরা মহরম মাস অতিক্রম করছি।আজ মহরমের বিষয়ে দোয়ার প্রতিও মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই।

এটি ছিল এক মর্মান্তিক ঘটনা, যেদিন অত্যাচার ও বর্বরতার চরম দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছিল। মহানবী (সা.)-এর স্নেহের দৌহিত্র এবং তাঁর বংশধরদের নির্মমভাবে শহীদ করা হয়েছিল। কিন্তু মুসলমানদের দুর্ভাগ্য যে, তারা এথেকে শিক্ষা গ্রহণের পরিবর্তে আজও এই অত্যাচার অব্যাহত রেখেছে। মহরমের মাসে শিয়া-সুন্নির পারস্পরিক দ্বন্দ্ব কিংবা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের ঘটনা বেড়েই চলেছে। উভয় পক্ষে প্রাণহানি হচ্ছে। বরং এই ফির্কাবাজি এবং ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার বাসনা মুসলিম বিশ্বে নৈরাজ্য ও হানাহানি সৃষ্টি করেছে। সারা বছরই উলেমাদের পক্ষ থেকে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে এবং সরকারের পক্ষ থেকেও পরস্পরের বিরুদ্ধে জুলুম ও অত্যাচারে প্রদর্শন হয়ে চলেছে। তাদের হুঁশ আর ফেরে না, তারা কোন শিক্ষা নেয় না। কিছুটা তো খোদাকে ভয় করা উচিত।

আল্লাহ্তা'লা তাদের অরাজকতা দূর করার লক্ষ্যে স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এক ঐশী ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করেছেন। কিন্তু তারা তা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত নয়। এরা মসীহ মওউদ (আ.)-এর বয়আতে আসতেই চায় না আর এটিই একমাত্র উপায়, যেটা এই উম্মতকে উম্মতে ওয়াহেদা বা এক জাতি সত্তায় পরিণত করতে পারে এবং যাবতীয় নৈরাজ্যের অবসান ঘটাতে পারে। মুসলমানদের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাধ্যমেই তাদের সম্মান প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এটিই একমাত্র উপায়। যদি তারা অনুধাবন করত!

মহরম মাসের এই দিনগুলোতে আহ্মদীদের অনেক বেশি দরূদ শরীফ পাঠ ও মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতির জন্য দোয়ার প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত। নিজেদের অবস্থার উন্নয়নএবং আল্লাহ্তা'লার সাথে সম্পর্ক নিবিড় করার প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত। আল্লাহ্তা'লা সবাইকে এর তৌফিক দান করুন।

যেমনটি আমি বলেছিলাম,কয়েকজন শহীদ ও মরহুমের স্মৃতিচারণ করব। একজন শহীদ হয়েছেন। শহীদের নাম হল বোঞ্জা মাহমুদ সাহেব যিনি জামাত আহমদীয়া তামানাজওয়ার (টোগো)-র অধিবাসী ছিলেন। ২১ শে জুন সন্ত্রাসীরা তাঁর বাড়িতে ঢুকে তাঁকে শহীদ করে দেয়। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।' তাঁর বয়স হয়েছিল চৌষট্টি বছর। তাঁর পরিবারে রয়েছেন দুই স্ত্রী এবং চৌদ্দজন সন্তান।

মুবাল্লিগ নভীদ নাঈম সাহেব লেখেন, টোগোর উত্তরাঞ্চলের প্রধান শহরের কাছাকাছি তামানাজওয়ার জামাত অবস্থিত। এই এলাকাটি বুর্কিনাফাসো সীমান্তে অবস্থিত। বোঞ্জো সাহেব এই জামাতের প্রাথমিক সদস্যদের একজন হওয়ার তৌফিক লাভ করেছিলেন। কৃষিকাজ করে নিজের জীবিকা নির্বাহ করতেন। একটি অস্থায়ী বাসস্থান তৈরী করেছিলেন যেখানে বর্ষাকালে স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে স্থানান্তরিত হয়ে যেতেন। শুষ্ক আবহাওয়ায় গ্রামে চলে আসতেন, যেটা অনেক দূরে অবস্থিত ছিল। এরপর বর্ষাকালে পুনরায় সেখানে চলে যেতেন। বর্তমানে তিনি নিজের খামারবাড়িতেই ছিলেন, যখন ২১ শে জুন রাত্রি আটটার সময় চারজন সন্ত্রাসী তাঁর বাড়িতে প্রবেশ করে টর্চ জ্বালায়। তাঁর চৌদ্দ বছরের ছেলে বাড়িতে আলো দেখে দ্রুত সেখানে এসে দেখে তার পিতাকে সন্ত্রাসীরা ঘিরে রেখেছে। এই দৃশ্য দেখে সে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। যাইহোক এরপর সন্ত্রাসীরা মরহুমের চিবুকের নীচে বন্দুক রেখে ফায়ার করে দেয়। গুলি নাক ভেদ করে বের হয়ে যায়। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। এরপর সন্ত্রাসীরা সেখান থেকে চলে যায় এবং বাড়ির আর কোন সদস্যের কোন ক্ষতি করে নি। অনুমান করা যায়, তাঁকে শহীদ করা তাদের উদ্দেশ্য ছিল, এই অভিপ্রায় নিয়েই তারা এসেছিল। ঘটনার সংবাদ পেয়েই সেখানে মিলিটারী বাহিনীও পৌঁছে যায়। সরকারের ক্ষমতা বর্তমানে অত্যন্ত সীমিত। সন্ত্রাসীরা সব কিছু নিজেদের আয়ত্বে রেখেছে। সেনাবাহিনী মৃতদেহকে নিজেদের আয়ত্বে নেওয়ার আশপাশের এলাকা তদন্ত করার পর এবং সামান্য আনুষ্ঠানিকতা পালন করার পর পরের দিনই মৃতদেহকে তাদের পরিবারে হাতে তুলে দেয়।

উক্ত অঞ্চলের স্থানীয় মুবাল্লিগ মামা বেলু সাহেব লেখেন,মরহুম প্রারম্ভিক বয়আতকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। একেবারে গোঁড়ার দিকে তিনি বয়আত করেন। বয়আতের পর তিনি নামায এবং জামাতের যাবতীয় অনুষ্ঠানে যথারীতি অংশগ্রহণ করতেন।অনুরূপভাবে নিয়মিত চাঁদাও দিতেও শুরু করেন।

তাঁর হালকার মুবাল্লিগ জাদামা তাহের সাহেব বলেন, ২০০৭ সালে বয়আত করার অব্যবহিত পরেই রমযান শুরু হয়। বর্ষাকাল ছিল সেটা। ফসলের জন্য ক্ষেত প্রস্তুতের কাজ শুরু হয়েছিল। গ্রামের কয়েকজন মানুষ তাঁকে নিয়ে হাসি-তামাশা করতে শুরু করে। তারা বলছিল এখন তুমি মুসলমান হয়েছ। এখন রোযা রাখবে না কি ক্ষেতে কাজ করছে? কেননা রোযা রেখে এত পরিশ্রম করতে পারবে না। অপরদিকে আমরা অনেক পরিশ্রম করব আর আমাদের ফসল ভাল হবে। তিনি উত্তর দেন, আমি মন থেকে ইসলাম গ্রহণ করেছি। তাই রোযা অবশ্যই রাখব।কৃপার মালিক আল্লাহ। যতটা পারব কাজ করব, যতটুকু আমার ভাগে আছে সেটা পাব।খোদা যতটুকু চাইবেন অবশ্যই দান করবেন। আল্লাহ্ এমন করলেন যে, সেই কয়েকদিন বৃষ্টি থেমে গেল আর পুরো রমযান বৃষ্টি হয় নি। তিনিও অক্লেশে রোযা রাখেন। আর ঈদের দিন বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। যেভাবে সেখানকার গ্রামগুলিতে চাষাবাদ হয়, পুনরায় সকলে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ক্ষেতের দিকে যান। আল্লাহ্ তা'লা তাদের কাজেও বাধা তৈরী করে দেন যারা তাঁকে হাসি-ঠাট্টা করত আর এইরূপে আল্লাহ তা'লা নিজের ইবাদতের তৌফিক দান করেন।

জামাত প্রতিষ্ঠার চার বছর মরকযের পক্ষ থেকে মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা তৈরী হয়। অ-আহমদীরা অনেক জোরাজুরি করে আর বলে যে তোমাদের পৃথক মসজিদের প্রয়োজন কি?তোমরা আমাদের মসজিদেই নামায পড়। কিন্তু তিনি বলেন, আমরা নিজেদের পৃথক মসজিদ তৈরী করব। মসজিদ তৈরীর পর যখনই তিনি গ্রামে থাকতেন পাঁচ ওয়াক্ত মসজিদে এসে নিয়মিত নামায পড়তেন। তাঁর বড় ভাই ইয়াকুব সাহেব বলেন, তিনি অত্যন্ত কোমল হৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। কখনও কারো মন্দ চিন্তা করেন নি। পরিবারের কোন সমস্যা যদি কারো দ্বারা সমাধান হত না, তখন তারা তাঁর কাছে আসতেন মরহুম অনায়াসে সেই সমস্যার সমাধান করে দিতেন।

আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তাঁর সন্তান-সন্ততিও ভবিষ্যত প্রজন্মকেও পুণ্যের ধারা অব্যাহত রাখার তৌফিক দান করুন। আল্লাহ্ তা'লা উক্ত অঞ্চলের সন্ত্রাসবাদও নির্মূল করুন এবং শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ সৃষ্টি করুন। সেখানকার পরিস্থিতি বলতে গেলে মানুষের মধ্যে পরস্পর ঝগড়া বিবাদ কিম্বা মুসলমান বিভিন্ন দল অরাজকতা সৃষ্টি করে রেখেছে। কিন্তু এসব কিছুর পৃষ্ঠপোষকতা হচ্ছে কোন পরাশক্তির পক্ষ থেকে যারা নিজের স্বার্থের জন্য এদের দেশে সন্ত্রাসবাদের জন্ম দেয় আর নিজেরাই শান্তি প্রতিষ্ঠার বয়ান দিয়ে সমব্যথী সাজার চেষ্টা করে। এরা যদি পৃষ্ঠপোষকতা না করে তবে এই সংগঠন চলতেই পারে না। আর মুসলমানেরা বুঝিছে হচ্ছে না যে, আমরা কি করছি। কিছু মুসলিম সংগঠন রয়েছে, কিছু রাজনীতিক ব্যক্তিত্ব রয়েছে যারা এই সব সন্ত্রাসীদের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হল রশীদ আহমদ সাহেব, সাবেক সহকারী নায়ের উমুরে আমা, যিনি নুর হোসেন সাহেবের পুত্র ছিলেন। সম্প্রতি ৮৬ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।

তিনি কাদিয়নে জন্ম গ্রহণ করেন। জন্মগত আহমদী ছিলেন তিনি। তাঁর পরিবারে আহমদীয়াতের সূত্রপাত তাঁর পিতা নুর হোসেন সাহেবের মাধ্যমে যিনি ১৯২৪ সালে খিলাফতে সানিয়ার যুগে বয়আত করে আহমদীয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা কাদিয়ানে লাভ করেন। পাকিস্তান গঠনের পর ম্যাট্রিক করার পর তিনি জামাতের সেবাদান শুরু করেন। ১৯৯৮ সালে তিনি অবসরের পর পুনর্বহাল হন। ২০২১ সাল যতদিন তিনি সুস্থ সবল ছিলেন,সেবা করার তৌফিক লাভ করেছেন। মরহুমের মোট সেবাদান প্রায় ৬৫ বছর।

তিনি বহু গুণাবলীর আধার ছিলেন। প্রতিদিনের কাজ প্রতিদিন করতে অভ্যস্ত ছিলেন। জামাতের প্রতি যারপরনায় নিষ্ঠাবান এবং দায়িত্বশীল হওয়া ছাড়াও জামাতের সমস্ত কাজ করার সময় গোপনীয়তা বজায় রেখে চলতেন। সময়ানুবর্তিতা তাঁর বিশেষ গুণ ছিল। ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর চাঁদা দানের বিষয়ে বিশেষ যত্নবান থাকতেন। প্রথম অগ্রাধিকার হিসেবে চাঁদা দিতেন। জামাতের প্রতিটি আহ্বানে সাড়া দেওয়ার চেষ্টা করতেন। আত্মীয়-স্বজনদের সাথে একাত্মবোধের সম্পর্ক রেখেছিলেন। অভাবীদের নীরবে নিভৃতে সাহায্য করতেন। খিলাফতের প্রতি তাঁর বিশেষ ভালবাসা ও সম্পর্ক ছিল। খিলাফতে সানিয়া থেকে খিলাফতে খামিসা পর্যন্ত সমস্ত খিলাফতের যুগে তিনি বিভিন্ন সেবাদানের তৌফিক লাভ করেছেন আর অত্যন্ত বিশ্বস্তার সাথে সেবা করেছেন। তিনি নীরবে কাজ করে যেতেন আর তিনি জামাতের অনেক মুল্যবান সেবা করার তৌফিক লাভ করেছেন। ১৯৭৪ ও ১৯৮৪ সালের সংকটময় যুগে পূর্ণ উদ্যমে বিরোধিতাপূর্ণ পরিস্থিতির সামনে বুক চিতিয়ে মোকাবলা করার তৌফিক পেয়েছেন। ৭৪ সালের বিরোধিতাপূর্ণ পরিস্থিতিতে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে আর গ্রেপ্তার করে তাঁকে বাসে করে ফয়সলাবাদ নিয়ে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় বিরোধিদের ভিড় বাসের উপর আক্রমণ করে, যে বাসে করে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। পুলিশ এবং বাসের অন্যান্য যাত্রীরা পালিয়ে যায়। পুলিশও তাদেরকে ছেড়ে পালায়। পুলিশ তাঁকে হাতকড়া পরিয়ে রেখেছিল। মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা তাঁর হাতকড়া পরিহিত অবস্থায় তাঁকে ছুরি দিয়ে আঘাত করে ক্ষতবিক্ষত

করে দেয়। অলৌকিকভাবে তাঁর প্রাণ রক্ষা হয়। কয়েম মাস হাসপাতালে থাকেন। এরপর পুনরায় জেলে পাঠানো হয়। এই কারণে তাঁর আঙুলও কেটে গিয়েছিল। তাঁর মুখমণ্ডলেও আঘাত লাগে এবং দীর্ঘদিন কথা বলতেও তাঁর কষ্ট হত। কিন্তু যাইহোক আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রাণ রক্ষা করেন।

১৯৭৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাবোয়ায় ভিত্তিহীন অভিযোগের ভিত্তিতে হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) এবং জামাতের অন্যান্য কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মুকদ্দমা করা হয়। এর মাঝে রাশিদ সাহেবেরও নাম ছিল। দীর্ঘদিন মুকদ্দমাটি চলে। ১৯৮৭ সালে রশীদ সাহেবের বিরুদ্ধে অন্যান্য তিনজন জামাতীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে রাবোয়া থানায় আরও একটি মুকদ্দমা করা হয় এবং অনেক বছর তাঁকে আদালতে ছোটাছুটি করতে হয়।

তাঁর কন্যা আমাতুস সবুর বলেন, তিনি বাজামাত নামাযের প্রতি নিয়মানুবর্তী,হকুল ইবাদের প্রতি যত্নবান,অন্যের দুঃখ-কষ্টের প্রতি সহানুভূতি পোষণকারী ছিলেন। অনেক বার এমনও হয়েছে যে,কেবল মোকদ্দমায় ইতি টানতে তিনি নিজের প্রাপ্য অধিকারও ত্যাগ করে দিতেন। মায়ের মৃত্যুর পর আমি তাঁর কাছে চলে আসার সিদ্ধান্ত নিই। আমার সন্তান-সন্ততিসহ আমি তাঁর কাছে চলে আসি। তাঁর কাছে আসতেই তিনি আমাকে উপদেশ দিলেন, আমার কাছে থাকতে হলে ছেলেদের বুঝিয়ে দাও যে, তাদেরকে বা-জামাত নামাযের বিষয়ে নিয়মানুবর্তী হতে হবে,জামাতের বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করতে হবে। সন্ধ্যার পর ঘরের বাইরে যাবে না আর জামাতের কর্মকর্তারা আহ্বান করলে অস্বীকার করবে না। এই তরবীয়তের আমার অনেক উপকার হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন,তাঁর পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং তাঁর সন্তান-সন্ততি এবং ভবিষ্যত প্রজন্মকেও পুণ্যের ধারা অব্যাহত রাখার তৌফিক দান করুন।

পরের স্মৃতিচারণ হল নায়েব নাযের উমুরে আমাচৌধুরী মুতিউর রহমান সাহেবের, যিনি সম্প্রতি ৮৯ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।

তিনি জন্মগত আহমদী ছিলেন। তাঁর বংশে আহমদীয়াতের সূত্রপাত হয় তাঁর পিতা চৌধুরী আলি আকবর সাহেবের মাধ্যমে, যিনি ১৯১৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে খিলাফতে সানিয়ার যুগে বয়আত করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। পাকিস্তান গঠনের পর তাঁর পিতা চৌধুরী আলী আকবর সাহেব নায়েব নাযির তালিম হিসেবে জামাতের সেবা করার তৌফিক লাভ করেন। চৌধুরী মুতিউর রহমান সাহেব প্রাথমিক শিক্ষার্জন করেন কাদিয়ানে। পাকিস্তান গঠনের পর শিক্ষাজীবন শেষ করে শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত হন। অবসর গ্রহণের পর নিজেকে জামাতের জন্য উপস্থাপন করেন এবং নায়েব নাযির হিসেবে আমৃত্যু পঁচিশ বছরের বেশি সময় জামাতের সেবা করার তৌফিক লাভ করেন। নীরবে কাজ করে যাওয়া তাঁর প্রকৃতির অংশ ছিল।

চৌধুরী মতিউর রহমান সাহেব বহু গুণাবলীর আধার ছিলেন। খুব কম বয়সে ওসীয়ত ব্যবস্থাপনার অংশ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। ওসীয়তের হিসাবে নিয়ম করে স্বচ্ছতা বজায় রাখতেন। সময়ানুবর্তী ছিলেন। নিয়মিত বা-জামাত নামায পড়তেন। জামাতের চাঁদা প্রথমেই দিয়ে দিতেন। জ্ঞান পিপাসু ব্যক্তি ছিলেন। সরল প্রকৃতিকর ব্যক্তি ছিলেন। সকলের সঙ্গে বন্ধুসুলভ ও ভালবাসার সম্পর্ক ছিল। যদি কখনও কোন কর্মীর সাথে মনমালিন্য হত তবে তিনিই প্রথমে মৈত্রীর হাত বাড়িয়ে দিতেন। অফিসের পক্ষ থেকে যে দায়িত্বই তাঁকে দেওয়া হত তিনি তা দ্রুততম সময়ে শেষ করতেন। কাজ ঝুলিয়ে রাখাকে তিনি ঘোর অপছন্দ করতেন এবং শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তাঁর এই গুণ অক্ষুন্ন ছিল। অফিসের কোন কাজ কখনও ঝুলিয়ে রাখতে দেন নি। তিনি সব সময় খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার এবং জামাতের ব্যবস্থাপনার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করার উপদেশ দিতেন। নিজের আত্মীয় স্বজন এবং তাঁর এক কন্যাকেও সব সময় একথাই বলতেন যে, খিলাফতের আনুগত্যেই কল্যাণ নিহিত।

তাঁর স্ত্রীও কয়েক বছর পূর্বে ইন্তেকাল করেছেন। তাঁর একমাত্র কন্যার স্বামীও মৃত্যুবরণ করেছেন। এই সকল আঘাত তিনি অত্যন্ত ধৈর্য ও অবিচলতার সঙ্গে সহন করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রতি ক্ষমা ও কৃপাসুলভ আচরণ করুন এবং তাঁর পদমর্যাদা উন্নীত করুন। যুক্তরাজ্যের সাবেক সদর আনসারুল্লাহ্ মরহুম চৌধরী এজাজুর রহমান সাহেব তাঁর চাচা ছিলেন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হল মনজুর বেগম সহেবার, যিনি সরগোধা নিবাসী মরহুম মাহমুদ আহমদ ভট্টি সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। সম্প্রতি তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। তিনি হযরতমসীহ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত চৌধরী গোলাম হোসেন সাহেব (রা.)-এর পুত্রবধু ছিলেন।

তাঁর পরিবারে আহমদীয়াতের সুত্রপাত হয় তাঁর চাচা চৌধুরী গোলাম নবী উলবী সাহেব এবং মাননীয় চৌধরী মহম্মদ আতা মহম্মদ উলবী সাহেবের মাধ্যমে। এই উভয় বুজুর্গ চিচা ওতনীতে একটি মোনাযারা শোনার পর বয়আত করেছিলেন। মরহুমার পিতা চৌধুরী মহম্মদ আব্দুল্লাহ্ উলবী সাহেব পরে তিন বছর গবেষণা করার পর ১৯৩৫ সালে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। তাঁর স্বামী মাহমুদ আহমদ ভট্টি মরহুম এবং তাঁর পুত্র তাহের মাহমুদ ভট্টি সাহেব খোদার পথে বন্দি দশা বরণের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। মরহুমার এই ভাই নাসীর আহমদ উলবী সাহেবকে ১৯৯১ সালে আহমদীয়াতের নামে সিন্ধ অঞ্চল দওড়ে শহীদ করা হয়েছিল। মরহুমা মূসী ছিলেন। তাঁর পরিবারে রয়েছেন তিন মেয়ে ও সাত ছেলে। তাঁর এক ছেলে আবিদ মাহমুদ ভট্টি সাহেব ওয়াকফে জিন্দগী তথা মুরুব্বী। তিনি জামাত আহমদীয়া তানজানিয়ার প্রিন্সিপাল এবং নায়েব আমীর। তিনি কর্মক্ষেত্রে থাকার কারণে মায়ের জানাযায় অংশগ্রহণ করতে পারেন নি।

উসচকের সাবেক সদর লাজনা কাইয়ুম সাহেবা বলেন, পনেরো বছর সদর লাজনা হিসেবে সেবাদানের তৌফিক পেয়েছেন। এই সময়কালে আমি মরহুমার বহু গুণাবলীর সাক্ষী থেকেছি। নামায রোযা নিয়মিত পালনকারী ছিলেন। পাঁচ ওয়াক্তের নামায অত্যন্ত যত্নসহকারে পড়তেন। যতদিন লাজনাদের মসজিদে আসার অনুমতি ছিল তিনি নিয়মিত জুমআর নামাযে আসতেন এবং সব সময় প্রথম সারিতে বসতেন। এখন সেখানে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, যার কারণে মেয়েরা মসজিদে জুমআ কিম্বা ঈদের নামায পড়তে যেতে পারে না। তারা বাড়িতে বসে অস্থির ও ব্যকুল হয়ে থাকে যে কবে পরিস্থিতি হবে আর কবে তারা মসজিদের যেতে পারবে। তাদের জন্যও দোয়া করবেন, আল্লাহ্ তা'লা পাকিস্তানের মানুষের প্রতি দয়া করুন। প্রতিটি ইজলাসে তিনি অংশগ্রহণ করতেন। রমযানে নিয়মিত লাজনাদের সঙ্গে তারাবীহর নামায মসজিদে এসে পড়তেন। সব নিজের সন্তান ও অন্যদের ছেলেমেয়েদেও মসজিদের সঙ্গে সম্পৃক্ত রাখতেন। ছোটদের অনেক ভাল তরবীয়ত করেছেন। সব সময় শিশুদের মাঝে জামাতে সেবায় উদ্বুদ্ধ করতেন।

তাঁর ছেলে কায়সর মাহমুদ ভট্টি সাহেব তাঁর চাঁদা প্রদানের বিষয়ে লেখেন- সব সময় নিজের হাত খরচের টাকা থেকে চাঁদা নিজেই দিতেন। নিজের সঞ্চিত অর্থ থেকেই ওসীয়তের চাঁদা দিতেন। তাঁর হিস্সা জায়েদাদের চাঁদা আমরা দিয়ে দিব বলে তাঁকে কতই না পিড়াপীড়ি করেছি, কিন্তু তিনি তা পত্রপাঠ খারিজ করে বলেছেন, আমি আমার খোদার পথে ওসীয়ত করেছি, এটা আমার অধিকার। ধর্মের প্রতি তাঁর বিশেষ আত্মাভিমান এবং আন্তরিকতা ছিল। ১৯৮৯ সালে গ্রামাঞ্চলের জামাতগুলির অবস্থা সঙ্গীন হয়ে ওঠে। বিরোধিরা গ্রামে আহমদীদের ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে এবং মসজিদগুলি দখল করে নিতে উদ্যত হয়। সেই সময় তিনি তাঁর স্বামী ও সন্তানদের বলেন, আপনারা মসজিদের দিকে যান। আমি একাই বাড়ি রক্ষা করব। সেই সময় পুলিশ তাঁর স্বামী ও পুত্রকে গ্রেপ্তারও করে নেয়। কিন্তু তিনি মোটেই বিচলিত হন নি। বরং তাঁর এই পুত্র বলেন, আমার মা সারা রাত জেগে কেঁদে কেঁদে দোয়া করতেন যে, হে আল্লাহ্ আমার স্বামী ও সন্তানদেরকে জামাতের সাথে অবিচলতার সাথে পাশে থাকার তৌফিক দান কর। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রতি ক্ষমা ও কৃপাসুলভ আচরণ করুন এবং তাঁর সন্তানদেরকেও তাঁর পুণ্য অব্যাহত রাখার তৌফিক দান করুন।

পরবর্তী স্মৃতি চারণ মাননীয় মাস্টার সাআদাত আশরফ সাহেবের যিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি(রা.) এর দেহরক্ষী মাননীয় খুশি মহম্মদ সাহেবের পুত্র ছিলেন। সম্প্রতি তিনি তিরাশি বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। তাঁর পরিবারে তাঁর স্ত্রী ছাড়াও রয়েছে তিন পুত্র ও তিন কন্যা। তাঁর এক পুত্র উসমান আহমদ তালেহ সাহেব সিরালিওনে মুরুব্বী সিলসিলা হিসেবে সেবা করছেন, যে কারণে তিনি জানাযায় অংশগ্রহণ করতে পারেন নি।

মুরুব্বী উসমান সাহেব লেখেন,আমার পিতা পেশায় শিক্ষক ছিলেন। ১৯৬৩সালে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে বশীরাবাদ সিন্ধ প্রদেশে হিজরত করে আসনে এবং তালিমুল ইসলাম হাই স্কুলে আরবীর শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন। বশীরাবাদ সিন্ধ হিজরতে পূর্বে তিনি পশ্চিম দারুর রহমত কলোনীতে থাকতেন। হযরত মৌলানা গোলাম রসুল সাহেব রাজিকি (রা.)-এর সঙ্গে তাঁর ভাল সম্পর্ক ছিল। তিনি বলেন, মৌলানা রাজিকি সাহেব (রা.) আমার পিতাকে নিজের পুত্র হিসেবে সম্বোধন করতেন এবং তাঁর পুণ্যময় প্রকৃতির কারণে তাঁকে অনেক ভালবাসতেন এবং স্নেহ করতেন। মৌলবী সাহেব তাঁর দ্বারা ব্যক্তিগত কাজও নিতেন। যখনই কেউ মৌলানা গোলাম রাজিকী সাহেবকে (রা.) দোয়ার উদ্দেশ্যে উপহার হিসেবে কোন অর্থ দিয়ে যেতেন, তখন তিনি আমার পিতাকে ডেকে বলতেন, এই অর্থ দারুল জিয়াফতে গিয়ে জমা করে এসো এবং এর রসিদ নিয়ে এসো। সেই অর্থ তিনি চাঁদা হিসেবে জমা করে দিতেন। একদিন গ্রীষ্মকালে হযরত মৌলানা রাজিকী সাহেব বাড়ি এসে দরজার কড়া নাড়েন। আমার পিতা বের হয়ে আসেন। মৌলানা সাহেবকে বলেন,এত গরমে আপনি কেন এলেন? আমাকে ডেকে পাঠাতেন, আমিই চলে আসতাম। মৌলানা সাহেব বললেন,

যদি তোমার অর্থের প্রয়োজন ছিল তো আমাকে নিজে বলে দিতে। হযরত মৌলানা রাজিকি সাহেব (রা.) আরও বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে আদেশ করে বলেছেন, সাআদাত এর অর্থের প্রয়োজন। যাও, তাকে টাকা দিয়ে এস। হযরত মৌলানা রাজিকি সাহেব পকেট থেকে টাকা বের করে তাঁকে দিয়ে চলে যান। এইরূপে তাঁরও আল্লাহ তা'লার সঙ্গো সম্পর্ক ছিল, আল্লাহ্ নিজেই তাঁর এক সৎ বান্দার মনে এই কথা সঞ্চারিত করলেন যে, যাও,তাকে সাহায্য কর।

খিলাফতের প্রতি তাঁর আনুগত্যের মান ছিল ঈর্ষণীয়।মুরুব্বী সাহেব লেখেন, কিছু দিন আগে আমি ছুটি নিয়ে তাঁকে দেখতে পাকিস্তান গিয়েছিলাম। তাঁর স্বাস্থ্য দেখে আমি বললাম, আপনি যদি যথাযথ মনে করেন, তবে আমি কি আরও কয়েকদিন ছুটি নিব? এতে তিনি বেশ কঠোরভাবে বললেন, ভবিষ্যতে এমন কথা চিন্তা করবে না বা মুখেও আনবে না। যুগ খলীফা তোমাকে একটি দলের নেতৃত্বে নিযুক্ত করেছেন,সেখানেই থাক। এবং শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত জামাতের সেবা এবং জামাতকে রক্ষা করার কাজে নিয়োজিত থাক। সব সময় ভাইবোনদের উপদেশ দিতেন যে, যখনই সফরে যাও দরূদ শরীফ পড়তে থাকবে। এবং 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' পড়তে থাকবে।

মুবাশ্বের গোন্দল সাহেবের সঙ্গো জড়িত একটি ঘটনার উল্লেখ করে তিনি লেখেন, তিনি যখন বি.এড এর পরীক্ষা দিচ্ছিলেন,তখন প্রশ্নপত্র অনেক কঠিন ছিল। পাঠ্যক্রমের বাইরে থেকেও কিছু প্রশ্ন এসেছিল। আমার পিতা কিছুক্ষণ পর কয়েকটি অতিরিক্ত পাতা নিয়ে লিখতে থাকেন। এরপর তিনি পুনরায় পাতা নিতে থাকেন। তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে বলল, উত্তর পত্র হিসেবে আমাদের যে খাতা দেওয়া হয়েছিল সেগুলোও তো আমরা পূর্ণ করতে পারি নি, তুমি কি লিখছিলে? তিনি বললেন, আমি যতটা জানতাম লিখে দিয়েছি। এরপর আমি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর কাসিদা 'ইয়া আইনা ফায়জিল্লাহি ওয়াল ইরফানি-এর কয়েকটি পঙক্তি লিখে দিয়েছি, যাতে যে কেউ পড়বে তার কাছে অন্তত প্রচার হয়ে যাবে। আর পরীক্ষায় পাশ করতে পারব কি না সেটা তো জানি না। পরীক্ষক আমাকে পাশ করুক না করুক, পঙক্তিগুলি পড়ে অন্তত সে এতটুকু তো উপলব্ধি করতে পারবে যে,এটা কোন আহমদী লিখেছে। আর তা না হলে সে অনুসন্ধান করে দেখবে যে এই কবিতার রচয়িতা কে? এইরূপে তবলীগের পথও উন্মোচিত হবে। যাইহোক আল্লাহ্ তা'লাও কৃপা করেন। সেই পরীক্ষায় কেবল তিনজন পাশ করে। আর আমার পিতাও তাদের মধ্যে একজন ছিলেন। এটা কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ ও কাসিদার বরকত ছিল।

প্রায় নফল ইবাদত করতেন এবং রোযা রাখতেন।কুরআন করীমের প্রতি ভালবাসা এবং তিলাওয়াতে প্রতি গভীর আগ্রহ ছিল। সব সময় তাঁকে কুরআন করীমের কয়েকটি সূরা মৃদুকণ্ঠে পাঠ করতে শোনা যেত।সব সময় তাঁকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর কাসিদা পাঠ করতে শুনতাম। প্রায় কাসিদা পড়ার সময় তাঁর চোখদুটি অশ্রুসজল হয়ে উঠত। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বই-পুস্তক অধ্যায়ন করতেন এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সাহাবাদের ঘটনা শোনাতেন। বিশেষ করে তাঁর ছাত্রদেরকে হযরত মৌলানা গোলাম রসুল রাজিকি (রা.) সাহেবের ঘটনাবলী অবশ্যই শোনাতেন। একজন উদ্যমশীল দায়ি ইলাল্লাহ ছিলেন। তিনি অত্যন্ত কর্মতৎপর মানুষ ছিলেন। জামাতের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সব সময় পূর্ণ উদ্যমে অংশগ্রহণ করতেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর ক্ষমা ও কৃপাসুলভ আচরণ করুন। তাঁর পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং তাঁর সন্তান সন্ততিদেরকেও তাঁর পুণ্যকে অব্যাহত রাখার তৌফিক দান করুন।

(সৌজন্যে: আল ফজল ইন্টারন্যাশনাল, ৬আগস্ট,২০২৪, পৃ: ২-৬)

৯ পাতার পর.....

****

উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠান আয়োজিত হচ্ছে আর যেভাবে আমরা সকলে এখানে একত্রিত হয়েছি। এর থেকে বোঝা যায় যে, আমরা সকলে পরিবর্তন চাই আর এর জন্য চেষ্টা করছি। তিনি বলেন, যেমনটি হুযূর আনোয়ারও ইতিপূর্বে বলেছেন, উগ্রবাদের নেপথ্যে বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতি দায়ী। যদি কোন দেশ উগ্রবাদকে নির্মূল না করে তবে তা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়তে থাকে। তিনি বলেন, বর্তমানে জামাত আহমদীয়া বিশ্বের জন্য শান্তি ও সহনশীলতার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পক্ষান্তরে ধর্মীয় উগ্রবাদ এবং চরমপন্থা শান্তি ও মানবাধিকার-উভয়ের জন্যই বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এই ধর্মীয় উগ্রবাদ আন্তর্জাতিক স্তরে সংঘটিত সন্ত্রাসবাদের সঙ্গো ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। তিনি বলেন, বর্তমান যুগে মুষ্টিমেয় জিহাদী সংগঠন কোনওভাবেই প্রকৃতই ইসলামকে উপস্থাপন করে না। জামাত আহমদীয়া এই বাস্তব সম্পর্কে সম্যকরূপে অবগত। কেননা এই জামাত সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে, যেমন পাকিস্তান থেকে ইন্ডোনেশিয়া, নাইজর থেকে কিরঘিযিস্তান পর্যন্ত সর্বত্র অন্যায় অত্যাচার সহ্য করেছে। আর বিভিন্ন সময়ে ইউরোপীয় পার্লামেন্টে এ বিষয়ে রেজুলেশন পাস হয়েছে। তিনি বলেন, ধর্মীয় উগ্রবাদের কারণে আমরা সকলেই ভুক্তভোগী। আর এই সব দেশগুলির নিরাপত্তার জন্য এক বিপদ হয়ে দেখা দিয়েছে। এছাড়াও এই কারণে মৌলিক মানবাধিকারও লঙ্ঘিত হয়েছে। গত দশকে ইউরোপীয়ন দেশের সরকারগুলি উগ্রবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষার জন্য অনেক চেষ্টা করেছে।

তিনি বলেন, পাকিস্তান এই মুহূর্তে ধর্মীয় উগ্রবাদকে উসকানি দিচ্ছে। দেশের বিচারালয়গুলিতে প্রকাশ্যে ধর্মের ভিত্তিতে বৈষম্য করা হচ্ছে। পাকিস্তানের ব্লাসফেমি আইন এবং আহমদীদের বিরুদ্ধে প্রণীত আইন এই ধরণের বৈষম্যকে যথারীতি সাংবিধানিক বৈধতা দান করে। এছাড়াও অনেক সময় এই আইনগুলি সহনশীলতাকে হ্রাস করার ক্ষেত্রেও সহায়ক হয়। কেউ যদি এই আইনগুলিতে পরিবর্তন করতে চায়, যেমন পাকিস্তানের একজন গভর্নর সালমান তাসির এর বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁকেও নিজের প্রাণের বিনিময়ে এর মূল্য চোকাতে হয়েছিল। জামাত আহমদীয়া এই মুহূর্তে পাকিস্তানে ক্রমাগত বিপদের মধ্যে বাস করছে। পাকিস্তানে এমন কোন মাস নেই যাতে কোন আহমদীকে হত্যা করা হয় নি। আর আর এক্ষেত্রে অপরাধীর ধরা পড়ার মত ঘটনা নিতান্তই বিরল। সরকারের এবিষয়ে মোটেই কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। জামাত আহমদীয়ার সঙ্গো আমার বহু বছরের সম্পর্ক। আর আমি জানি যে, এই জামাত দৃঢ় সংকল্পের সাথে একের পর এক উন্নতির সোপান অতিক্রম করে চলেছে। তাদের নীতিবাক্য হল-ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে' সেই সকল জেহাদী উগ্রবাদী সংগঠনগুলির জন্য জবাব যারা পৃথিবীর শান্তি পরিস্থিতি বিঘ্নিত করছে মুসলমানদের নিজেদেরই এই উগ্রবাদের উত্তর দেওয়া প্রয়োজন। যেমনটি জামাত আহমদীয়া এই মুহূর্তে উগ্রবাদের বিরুদ্ধে জবাব দিচ্ছে।

কাফেররা আশ্চর্যান্বিত ছিল যে, তাদের মধ্য থেকে একব্যক্তির উপর কিভাবে ওহী হল? একই অবস্থা বর্তমান যুগের অনেক মুসলমানদের। তারাও একথা বলে যে, হযরত ঈসা (আ.) আকাশ থেকে নেমে এসে আমাদেরকে লাঞ্ছনা এবং পশ্চাদপদতা থেকে বের করবেন-আমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তির জন্ম হতে পারে না যে আমাদের চিকিৎসা করবে।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা ইউনুসের ৪ নং আয়াত- اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন-কাফেররাআশ্চর্যান্বিত ছিল যে, তাদের মধ্য থেকে একব্যক্তির উপর কিভাবে ওহী হল! অধঃপতিত জাতির মধ্যে এই চেতনা কাজ করে যে তাদের মধ্যে কোনও বড় সত্তা সৃষ্টি হতে পারে না। অর্থাৎ কাফেররা নিজেদের বিষয়ে এতটাই আশাহত হয়ে পড়েছিল যে, তাদের চিকিৎসা যে তাদের মধ্যেই বিদ্যমান সেকথা তারা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না। তাদের ধারণা ছিল, তাদের উন্নতি এবং সমৃদ্ধির এবং চিকিৎসার জন্য বাইরে থেকে কারো আসা উচিত। একই অবস্থা বর্তমান যুগের অনেক মুসলমানদের। তারাও একথা বলে যে, হযরত ঈসা (আ.) আকাশ থেকে নেমে এসে আমাদেরকে লাঞ্ছণা এবং পশ্চাদপদতা থেকে বের করবেন- আমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তির জন্ম হতে পারে না যে আমাদের চিকিৎসা করবে। এবিষয়টিতে পূর্ববর্তী জাতিগুলির সঙ্গো তাদের কিরূপ সামঞ্জস্য রয়েছে - সেই একই নিরাশা আর একই চিকিৎসার উপায়!

যারা জাতির উন্নতির জন্য হয় কোন উৎসাহ রাখতেন না, কিম্বা মনে করতেন, বাহ্যিক চিকিৎসা ছাড়া কিছুই হতে পারে না, যখন তাদের মধ্য থেকেই তাদের ভাই দাবি করল, 'আমি তোমাদের চিকিৎসা করব আর তোমাদেরকে উন্নতির দিকে নিয়ে যাব, তখন তাদের বিস্ময়ের অবধি ছিল না। তারা আশ্চর্যচকিত ছিল যে, যে বিষয় সম্ভব ছিল না তা সম্ভব করার দাবি এ কিভাবে করল?

দ্বিতীয় যে বিষয়টি তাদের জন্য আশ্চর্যের ছিল তা হল, এই দাবিদার দাবি করছে যে, তাকে মানুষকে সতর্ক করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ কিছু পুরোনো কথা ত্যাগ করে কিছু নতুন বিষয় অবলম্বন কর। এমন মানুষদের জন্য সব সময় একথা বিস্ময়ের হয়ে থাকে যে, রসুল বলছে বর্তমান ব্যবস্থাকে ভেঙ্গো নতুন ব্যবস্থাপনা অবলম্বন কর। কাফেরদের এই দুটি কথার মধ্যে স্ববিরোধ রয়েছে। একদিকে তো তাদের মধ্যে এতটা হতাশা রয়েছে যে, তারা মনে করে, তাদের চিকিৎসার জন্য তাদের মধ্য থেকে কেউ আসতে পারেনা। অপরদিকে তারা এনিয়ে লড়াই করে যে, তাদের ব্যবস্থাপনা কেন বদলে দিচ্ছে? অধঃপতিত জাতির এমনই দশা হয়ে থাকে। তারা চায় যেন কিছু ত্যাগ করতে হয় আর না কিছু কাজ করতে হয়। এক ব্যক্তি বাইরে থেকে এসে তাদের বর্তমান ব্যবস্থাপনা বজায় রেখে তাদেরকে উন্নতির দিকে নিয়ে যাবে। এরজন্য তাদেরকে শিক্ষা অর্জনও করতে হবে না, পরিশ্রমও করতে হবে না কিম্বা কোনও মন্দ কর্ম ত্যাগ করতে হবে না। বরং এক ব্যক্তি বাইরে থেকে এসে অন্যদেরকে মেরে ফেলবে আর সব কিছু তাদের হয়ে যাবে। তারা চিন্তা করে দেখে না যে, যদি পূর্বের ব্যবস্থাপনা সঠিক থাকত, তবে লাঞ্ছণা ও পশ্চাদপদতায় কেনই বা পড়ে থাকত? অতএব তাদের বর্তমান ব্যবস্থাপনা ভেঙ্গে দিয়েই পরিবর্তন সম্ভব।

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর স্পেন সফর, ২০১৩ (মার্চ, এপ্রিল)

(সাংবাদিক সম্মেলনের শেষাংশ)

ফরাসি সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আমরা আহমদীরা ইসলামেরই একটি ফির্কা যারা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত। আঁ হযরত (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, চতুর্দশ শতাব্দীতে যখন মুসলমানেরা ইসলামের শিক্ষা থেকে দূরে সরে যাবে, ইসলামের শিক্ষা ভুলে বসবে, তখন আল্লাহ্ তা'লা ইসলামকে পুনর্জীবিত করার উদ্দেশ্যে প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদীকে প্রেরণ করবেন, যেভাবে হযরত ঈসা (আ.) হযরত মুসা (আ.)-এর চৌদ্দশ বছর পরে এসেছিলেন। এই সাদৃশ্য নিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আঁ হযরত (সা.)-এর চৌদ্দশ বছর পর এসে ইসলামের সঠিক ও সত্যিকার শিক্ষাকে পুনরায় পৃথিবীর সামনে উপস্থাপন করেন, যে শিক্ষাকে মুসলমানেরা ভুলে বসেছিল। তাঁর মাধ্যমে জামাত আহমদীয়ার স্থাপনা হয় ১৮৮৯সালে। তিনি ঘোষণা করেন, আঁ হযরত (সা.) যে প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদীর আগমণের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, আমিই সেই ব্যক্তি। তিনি যখন এই দাবি করলেন, তখন তাঁর তুমুল বিরোধিতা হয় এবং তাঁর উপর মুকদ্দমা হয়। তাঁর উপর ঈমান আনয়নকারীদের উপর কঠোর নির্যাতন করা হয় আর বিগত ১২৩ বছর ধরে এই বিরোধিতার ধারা অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু জামাত আহমদীয়া ক্রমশ উন্নতি করেই চলেছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় বর্তমানে আমাদের সংখ্যা কোটির উর্দ্ধে আর প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষ জামাতে আহমদীয়ার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে আর আমরা এগিয়ে চলেছি। বর্তমানে যদি আমাদের সংখ্যা নগণ্য ও সীমিত হয় তবে ভবিষ্যতে দেখবেন কি হতে চলেছে, আমরা অনেক এগিয়ে যাব। সেই সময় প্রত্যেক ধর্মের সত্যান্বেষীরা একথা জেনে যাবে যে, আমাদের গুরুত্ব কি আর সত্য ও প্রকৃত ইসলাম কি।

একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আমাদের বার্তা হল প্রত্যেক ব্যক্তিই যেন প্রত্যেকের অধিকার প্রদান করে এবং পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের পরিবেশ তৈরী হয়।

একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: মুসলমানেরা যদি ইসলামের সঠিক শিক্ষার উপর আমল করে তবে মুসলমানদের যে বর্তমান চরিত্র ও কার্যকলাপ, সেটা হবে না। বরং পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব বজায় থাকবে। বিগত এক শতাব্দী থেকে আমরা এই শান্তি ও সৌহার্দ্যের শিক্ষাই প্রচার করছি।

একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: ইসলাম সকল ধর্মকে সম্মান করে। এবং সমস্ত ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ও নেতাদের সম্মান করে, কাউকে অসম্মান করে না। বরং ইসলাম শিক্ষা দেয়, তোমরা অপরের প্রতিমাগুলোকেও দোষারোপ করো না, আর তাদের মান্যকারীদেরকেও গালমন্দ করো না। অন্যথায় তাদের মান্যকারীরা খোদা তা'লা সম্পর্কে কুকথা বলবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: পাকিস্তান একটি ইসলামিক দেশ। সেখানে ধর্মীয় নেতা ও রাজনৈতিক নেতাদের ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার উপর আমল করা উচিত। কিন্তু এমনটা হচ্ছে না। গতকালই লাহোরে জামাত আহমদীয়ার একটি কবরস্তানে গিয়ে বিরোধিরা ১২০টি কবরের সম্মান পদদলিত করেছে এবং কবরের ফলক ভেঙ্গে ফেলেছে। আহমদীরা কেবল সেই শিক্ষাই দেয় যা কুরআন আমাদের শিক্ষা দেয় আর সেই শিক্ষার উপরই আমল করে। আমরা কুরআনের বিরুদ্ধে কোন কথা বলি না।

একটি প্রশ্নে উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আঁ হযরত (সা.) এর যুগে মহিলাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। মহিলারা সম্পত্তি ও উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। আঁ হযরত (সা.) তাদেরকে সম্পত্তি ও উত্তরাধিকার এর যোগ্য আখ্যায়িত করেন এবং তাদেরকে উত্তরাধিকার প্রদান করেন। কয়েক দশক থেকে ইউরোপেও মহিলাদেরকে এই অধিকার দেওয়া হচ্ছে। আঁ হযরত (সা.) মহিলাদেরকেও বিচ্ছেদ ঘটানোর অধিকার প্রদান করেছেন। অথচ ইসলামের পূর্বে মহিলাদেরকে তাদের এই অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছিল। কয়েক দশক থেকে ইউরোপেও মহিলাদেরকে বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: হিজাব বা পর্দা করা মহিলাদের অধিকার। আহমদী মেয়েরা যখন পর্দা করে তখন তারা নিজেদেরকেও বেশি সুরক্ষিত মনে করে। আর তারা ইসলামের শিক্ষা মেনে এমনটি করে থাকে। পর্দা নিয়েই তারা বিভিন্ন কাজ কর্ম করতে পারে।

পাকিস্তান একটি ইসলামিক দেশ,যেখানে ইসলামি শিক্ষার বিষয়ে কঠোরতা অবলম্বন করা হয়, সেখানে আশি শতাংশ মহিলা পর্দা করে না।

এক বিট্রিশ মহিলা একটি নিবন্ধে লেখেন, পুরুষরা একারণে পর্দার বিরোধিতা করছে এবং এর বিরুদ্ধে হৈচৈ করছে যে, তারা মহিলাদেরকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখতে চায়।

ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ এবং এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান

হুযুর আনোয়ার (আই.) স্টেজে আসেন। হুযুরের ডান দিকে আজকের অনুষ্ঠানের স্বাগতিক তথা ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের সদস্য ডক্টর চার্লস ট্যানক উপবিষ্ট ছিলেন।

স্টেজের একদিকে ইউরেপিয়ান পার্লামেন্টের পতাকা এবং অপরদিকে আহমদীয়াতের পতাকা উড্ডীন ছিল। আজ ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের ইতিহাসে প্রথমবার তাদের সভাকক্ষে আহমদীয়াতের পতাকা উড্ডীন ছিল। (আলহামদোলিল্লাহ)

অনারেবল ডক্টর চার্লস ট্যানক সাহেবের বক্তব্য

আজকের অনুষ্ঠানের শুরুতে সর্বপ্রথম অনুষ্ঠানের আয়োজক ডক্টর চার্লস ট্যানক সাহেব বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের এই স্থানে আহমদীয়া মুসলিম কমিউনিটির সঙ্গে দ্বিতীয় অনুষ্ঠান আয়োজিত হচ্ছে। কিন্তু গত বছর হুযুর আনোয়ার (আই.) আমাদের মাঝে ছিলেন না। তিনি কেবল বার্তা পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু এবার তিনি স্বয়ং সশরীরে এখানে উপস্থিত হয়ে এই অনুষ্ঠানটিকে আশিসমণ্ডিত করেছেন, যা থেকে আজকের এই অনুষ্ঠানের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়।

তিনি বলেন, আহমদীয়া মুসলিম কমিউনিটি আন্তর্জাতিক স্তরে শান্তির বার্তা প্রচারকরছে আর উগ্রবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। এখানে আসার পূর্বে একটি সফল সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে যে ভঙ্গিতে প্রশ্নোত্তর হয়েছে, তাতে আমি ব্যক্তিগতভাবে ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়েছি। মুসলমানদের নেতার পক্ষ থেকে এই ধরণের বার্তা আজ পৃথিবীর প্রয়োজন। এই শান্তির বার্তা বস্তুত আমাদের হৃদয়ের ধ্বনি, যা কেবল ইসলামের সঙ্গেই নয় বরং অন্যান্য সকল ধর্মের সঙ্গেও সম্পৃক্ত।

তিনি বলেন, কাল বিকেলে আমরা ইউরোপিয়ান পার্লমেন্টে ফ্রেন্ডস অফ দ্যা আহমদীয়া গ্রুপ এর উদ্বোধন করেছি।আহমদীয়া মুসলিম কমিউনিটি নিত্য দিন উন্নতির নতুন দিগন্ত স্পর্শ করছে আর এই মুহূর্তে প্রায় ১২ কোটি আহমদী সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে। প্রতিটি মহাদেশে এই জামাতের শাখা রয়েছে। পশ্চিমা বিশ্বে খুব কম মানুষ আহমদীয়া কমিউনিটির শিক্ষা সম্পর্কে অবগত আছে। কিন্তু 'ভালবাসা সকলের তরে ঘৃণা নয়কো কারো পরে' সংবলিত বার্তাটি সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে দেওয়া আমাদের কর্তব্য। এটি শান্তির বার্তা আর এটা কেবল মুসলমানদের জন্য বার্তা নয় বরং পৃথিবীর সমস্ত ধর্মের জন্য শান্তির বার্তা।

এস্টোনিয়ার সাংসদ টানি কলাম সাহেবের ভাষণ

তিনি বলেন, হুযুর আনোয়ারকে ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টে দেখে ভীষণ খুশি হলাম। আমরা এখানে সকলে শান্তি ও সৌহার্দ্যের বাণী থেকে উপকৃত হতে একত্রিত হয়েছি। আর এই বার্তাটি শোনার জন্য এটি সব থেকে ভাল সময়। যেমনটি হুযুর আনোয়ার বিভিন্ন সময় বর্ণনা করেছেন, পৃথিবীতে বিবাদ ও বিসম্বাদ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ন্যায় ও সুবিচারের অনুপস্থিতি এর মূল কারণ। এছাড়াও নিজের বিরোধি পক্ষকে পূর্ণ মনোযোগ সহকারে না শোনাও এর অন্যতম কারণ।

তিনি বলেন, আমাদের মাঝে একটি ধর্মবিশ্বাস অভিন্ন, যার সঙ্গে আমরা সকলে পরস্পরের সঙ্গে এক বন্ধনে আবদ্ধ। আর সেই মতবাদটি হল এক অদ্বিতীয় খোদার উপর ঈমান আনা। প্রত্যেক প্রমুখ ধর্ম আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে, সর্বপ্রথম খোদার সত্তাকে সম্মান করতে হবে এবং নিজের প্রতিবেশীদের প্রতি যত্নবান হতে হবে। যদি কোথাও জুলুম হয়, তবে সেই শিক্ষা খোদার কোন নবীর আনীত শিক্ষা নয়। আর এই বিষয়টি, আমার মতে, আমাদের সকলের জন্য একটি আলোকবর্তিকাস্বরূপ। আমাদের উচিত একে অপরের কথা শোনা। আমাদের পরস্পরকে সম্মান করা দরকার। আমার মতে, এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, আপনাদের জামাত চরমপন্থা ও অন্যায়কে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে, যা বর্তমান পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদকে একত্রিত করার জন্য আপনাদের দৃষ্টান্ত কেবল মতবাদ হিসেবে নয়, বরং ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি বলেন, আজ এই বার্তাটিকে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করার আমাদের কাছে একটা ভাল সুযোগ। আমি এটি জেনে আনন্দিত হয়েছি যে, ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের সদস্যরাও এর অংশ হচ্ছেন আর ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর হওয়া অত্যাচারের প্রতি মনোযোগ দিচ্ছেন।

পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী

বলেছেন, পাকিস্তানে আহমদীদের অবস্থা সন্তোষজনক আর আহমদী সম্প্রদায়ের উপর কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা নেই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সম্প্রদায়ের উপর সেখানে নির্যাতন চলছে। অতএব, এই বিষয়টি মাথায় রাখা এবং উক্ত সম্প্রদায়কে রাজনৈতিকভাবে এবং নৈতিকভাবে পৃথিবীর সকল স্থানে গিয়ে সাহায্য করা আমাদের কর্তব্য।

তিনি আরও বলেন, আমার সম্পর্ক পূর্ব ইউরোপের ছোট্ট দেশ এস্টোনিয়ার সাথে। ২১ বছর আগে আমাদের দেশ সোভিয়েত সংঘ থেকে স্বাধীনতা লাভ করেছিল। আমরা অত্যাচারপূর্ণ শাসনের সম্মুখীন হয়েছি আর আমরা ধর্মীয় নিপীড়নেরও অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। তাই আমরা হয়তো ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারি যে, সংখ্যালঘু হওয়ার অর্থ কি, বিশেষ করে এমন সংখ্যালঘু যাদের উপর নির্যাতন করা হয়। তাই আমাদের কর্তব্য হল এমন মানুষদের সাহায্য করা এবং এ বিষয়টি নিশ্চিত করা যে আপনারা নিজেদের যাবতীয় অধিকার উপভোগ করছেন।

ব্রিটেন থেকে ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের সদস্য বারোনেস সারাহ লুর্ডফোর্ড এর বক্তব্য

ভদ্রমহিলা বলেন, আমি ভীষণ আনন্দিত যে, আমাকে এই সম্মেলনে আমন্ত্রিত করা হয়েছে। আর আমি এজন্যও আনন্দিত যে, আমাকে ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের ফ্রেন্ডস অফ আহমদীয়া কমিউনিটি গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে।

তিনি বলেন, আহমদীয়া জামাতের সঙ্গে আমার সম্পর্ক অনেক পুরোনো। জামাতের একাধিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছি আর হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাতও করেছি।

তিনি বলেন, উগ্রপন্থার মোকাবেলা করার জন্য সর্বোত্তম সময় ও স্থান নির্বাচন করা হয়েছে। কেননা এটি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের একটি প্রধান প্রতিষ্ঠান যার কাজ সমগ্র ইউরোপীয় জাতির মাঝে ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টি করা।

তিনি বলেন, উগ্রপন্থা প্রসঙ্গে আমাদের ইউরোপের ইতিহাসকেও দৃষ্টিপটে রাখা উচিত, যখন বিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে উগ্রপন্থা ও জাতি বিদ্বেষের পরিণামে অনেক রক্ত ক্ষয় হয়েছে। আমরা সেই ইতিহাস কখনও ভুলতে পারি না। আর আমরা ইউরোপিয়ান জাতিসমূহের মাঝে সহনশীলতা, ভিন্ন মতামত পোষণকারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন, বাক-স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং মানবাধিকারকে দৃষ্টিপটে রাখার মত মূল্যবোধ সৃষ্টির চেষ্টা করেছি। আর ভবিষ্যতেও এই মূল্যবোধগুলির বিকশিত করতে থাকব।

তিনি বলেন, এই জামাতের নীতিবাক্য 'ভালবাসা সকলের তরে ঘৃণা নয়কো কারো পরে' সময়ের প্রয়োজন। দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, সারা বিশ্ব জুড়ে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে। কিন্তু আমরা এই সব নির্যাতন ও উৎপীড়নকে উপেক্ষা ক রতে পারি না। কেননা, আমরা বর্তমান যুগে বিশ্বপল্লীতে বসবাস করি। পাকিস্তান ও ইন্ডোনেশিয়া আহমদীদের উপর যে নির্যাতন চলছে সে বিষয়ে আমরা সম্যক অবগত আর ইউরোপিয়ন পার্লামেন্টের জন্যও বিষয়টি উদ্বেগজনক।

তিনি বলেন, দুর্ভাগ্যবশত আমরা এটাও দেখছি যে, যুক্তরাজ্যে কিছু চ্যানেল বিদ্বেষ প্রচারের কাজ করছে। দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোন সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায় নি। কিন্তু আমরা নিজেদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখব। আর আমরা একথাও ভালভাবে জানি যে, পাকিস্তানে শত সহস্র আহমদীদেরকে হত্যা করা হচ্ছে।

বক্তব্যের শেষে তিনি আরও একবার এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হওয়ার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

অনারেবল ক্লড মোরাইস এর বক্তব্য

ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের এই সদস্য বলেন: আজ এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে আমি ভীষণ আনন্দিত। ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টে অনুষ্ঠিত মিটিংগুলিতে সচরাচর এতবেশি উপস্থিতি থাকে না,যতটা আজ এখানে দেখা যাচ্ছে। অনুমান করা চলে এর কারণ হুযুর আনোয়ারের ভাষণ।

এই অনুষ্ঠানের পূর্বেও আজ হুযুরের সঙ্গে আমি সাক্ষাতের সুযোগ পেয়েছিলাম। সেই সময় হুযুর আনোয়ারকে বলেছিলাম, বর্তমান বিশ্বের পরিস্থিতি যে দিকে গড়াচ্ছে, তাতে আমাদেরকে জামাত আহমদীয়ার শান্তি ও সৌহার্দ্যের মতবাদ অবলম্বন করা প্রয়োজন। একে অপরের জন্য সহনশীলতা তৈরী করা এবং একে অপরকে সম্মান করার ভীষণ প্রয়োজন। আমার পূর্বের বক্তাও নিজের বক্তব্যে এই মতবাদগুলির কথা উল্লেখ করেছেন। এই মতবাদ কেবল পুঁথিগত নয়, বরং বর্তমান যুগে এগুলির উপর অনুশীলন করা ভীষণ জরুরী।

ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টে বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষ আছেন আর এই দৃষ্টিকোণ থেকে এই পার্লামেন্টের সারা বিশ্বে এক স্বতন্ত্র মর্যাদা রয়েছে। আমার নিজেরই শিকড় যুক্ত ভারতের এক খৃষ্টান পরিবারের সঙ্গে। কিছুকাল পূর্বে আমি পাকিস্তানে খৃষ্টানদের উপর হওয়া নির্যাতন প্রসঙ্গে পার্লামেন্টে প্রশ্ন তুলেছিলাম। সারা বিশ্বে যেখানেই মানবাধিকারের বিরুদ্ধাচরণ করা হোক বা কোন ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার হোক, এক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে প্রশ্ন তোলা জরুরী, বরং সারা বিশ্বেই এই বিষয়ে প্রশ্ন ওঠা উচিত। আমাদের সকলের নিজেদেরকেও প্রশ্ন করা উচিত।

তিনি বলেন, হুযুর আনোয়ারের এখানে আগমণ এ বিষয়ের ইঙ্গিত যে, মানুষ একে অপরের বিষয়ে জানতে আগ্রহী। আমার মতে, আহমদীয়া জামাতকে আরও ভালভাবে জানা প্রয়োজন। শান্তি ও সহনশীলতা সম্পর্কে তাদের বাণী ও মতবাদ অনুধাবন করা প্রয়োজন। এছাড়াও জাতি ও ধর্মের ভেদাভেদের উর্দ্ধে এসে মানবতার সেবা করাও এই জামাতের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। এই বিষয়গুলিকে আরও গভীরে গিয়ে অনুধাবন করা প্রয়োজন।

আজ সকালে আমি যখন হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাত করি, তখন একথার উল্লেখ করেছিলাম যে, কিছু সম্প্রদায় যারা ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে , তাদের বিষয়ে জানা ভীষণ জরুরী আর তাদের বার্তা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া জরুরী। আমি হুযুর আনোয়ারকে বলেছিলাম যে, এই বার্তাটিকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের থেকে উত্তম নির্বাচন হতে পারত না।

বক্তব্যের শেষে তিনি হুযুর আনোয়ারকে ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টে আসার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

পার্লামেন্ট সদস্য জিন ল্যাম্বার্ট এর বক্তব্য।

পার্লামেন্ট সদস্য জিন ল্যাম্বার্ট নিজের বক্তব্যে বলেন: সর্বপ্রথম আমি হুযুর আনোয়ার ও তাঁর সাথিবর্গকে এই অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাই। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব ধর্ম ও মতবাদ পোষণ করার অধিকার পূর্ণ রয়েছে, যেটা মৌলিক মানবাধিকার এর অন্তর্ভুক্ত। সাউথ এশিয়া ডেলিগেশন এর চেয়ারপারসন হিসেবে যখন আমাকে এই সব দেশে যেতে হয়, তখন এই দেশগুলির সরকার ও রাজনীতিক দলগুলির সঙ্গে মানবাধিকার প্রসঙ্গে বিভিন্ন প্রশ্ন আলোচনায় তুলে ধরি।

তিনি বলেন, এবছরই জুলাইয়ে তিন সদস্যের একটি দল ইসলামাবাদ (পাকিস্তান) গিয়েছিল। আমিও সেই দলের সদস্য ছিলাম। নিরাপত্তা সংক্রান্ত কারণে আমাদের ইসলামাবাদের বাইরে যাওয়ার অনুমতি ছিল না। যাইহোক ইসলামাবাদেই পাকিস্তানের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী, বিভিন্ন রাজনীতিক দলের নেতা, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং অন্যান্য রাজনীতিক ও অরাজনীতিক ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে সাক্ষাত হয়। আমি সেখানে তাদের সামনে কয়েকটি বিষয় উত্থাপন করেছিলাম।এর মধ্যে সবার প্রথমে ছিল মহিলাদের অধিকারের বিষয়টি। এরপর মৃত্যুদণ্ড-এর বিষয়ে আলোচনা হয়। আর পাকিস্তানের বর্তমান ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার প্রসঙ্গেও কথা বলেছিলাম। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ান গত নির্বাচনগুলিতেও পাকিস্তানে তাদের একটি কমিশন পাঠিয়েছিল আর এবারও আশা করা যাচ্ছে একটি কমিশন পাঠানো হবে।

পার্লামেন্টের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার কারণে আমার এমন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার অধিকার ছিল না যে, তারা কোন ধর্ম ও ফির্কার মানুষ। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগতভাবে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার অধিকার আছে, তার সম্পর্ক যে ধর্মের সঙ্গেই হোক না কেন।

গত নির্বাচনগুলিতেও এই প্রশ্ন তোলা হয়েছিল যে, জামাত আহমদীয়ার সঙ্গে যাদের সম্পর্ক, তারা কিভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে? আমরা সেই সময় নির্বাচন কমিশন এবং পাকিস্তান সরকারকে স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলাম যে, নির্বাচন কমিশন ও পাকিস্তান সংসদকে এই সমস্যার সমাধান বের করতে হবে। কেননা, একটা সম্প্রদায়ের মানুষ ভোট দিতে চায় এবং নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে চায়, কিন্তু নির্বাচন প্রক্রিয়ায় তাদেরকে ভোট দেওয়ার অনুমতি না দেওয়া এবং একপ্রকার তাদের উপর ভোটাধিকার প্রয়োগে নিষেধাজ্ঞা চাপানো কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এই বিষয়টিকে আমরা এবছরও আমাদের রিপোর্টে তুলে ধরেছি এবং এবছরও নির্বাচনের বিষয়টিকে পাকিস্তান নিয়ে যাব।

অনারেবল ডক্টর চার্লস ট্যানক সাহেবের বক্তব্য

ডক্টর চার্লস বলেন: ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের সদস্য হিসেবে আমার প্রায় তেরো বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। লোকে প্রায় আমাকে প্রশ্ন করে যে, এই সময়ে আমি কি করেছি? আমি তাদেরকে বলি, যেমনটি আজ যুগের প্রয়োজন অনুসারেই 'শান্তির' বিকাশের

(এরপর ৭ পাতায়.....)

ইউরোপীয় পার্লামেন্ট ব্রাসেল্‌স, বেলজিয়াম-এ হুযুর আনোয়ার এর ঐতিহাসিক ভাষণ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম- আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত অসীম দাতা, বারবার দয়াকারী।সকল সম্মানিত অতিথিবর্গ!

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু- আপনাদের সকলের উপর শান্তি এবং আল্লাহ্‌র আশিস অনুগ্রহ বর্ষিত হোক। প্রথমে আমি এ অনুষ্ঠানের আয়োজকদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই যারা আমাকে এখানে ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টে আপনাদের সকলকে সম্বোধন করে কিছু বলার সুযোগ করে দিয়েছেন। আমি আরো ধন্যবাদ দিতে চাই সকল সম্মানিত অতিথিবৃন্দকে, যারা বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত রয়েছেন এবং অন্যান্য অতিথিবৃন্দকে যারা এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনেক বড় কষ্ট স্বীকার করেছেন।

যারা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত এমনকি তাঁরা যারা তুলনামূলকভাবে কম ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত, কিন্তু একক আহমদীদের সঙ্গে যাদের যোগাযোগ রয়েছে, তারা এ বিষয়ে পূর্ণ সচেতন হয়ে থাকবেন যে, একটি সম্প্রদায় হিসেবে আমরা সর্বদা শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার বিষয়ে বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকি। আর নিশ্চিতভাবে আমাদের সাধ্যের মধ্যে আমরা এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য পূর্ণ প্রচেষ্টা করে থাকি।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রধান হিসেবে যখনই সুযোগ আসে আমি নিয়মিত এ বিষয়গুলোর উপর আলোচনা করে থাকি। আমি যে শান্তি ও পারস্পরিক

সৌহার্দ্যের বিষয়ে কথা বলে থাকি, তা এজন্য নয় যে আহমদীয়া সম্প্রদায়ের মাধ্যমে কোন নতুন শিক্ষার আগমন ঘটেছে। যদিও এটি নিশ্চিতভাবে সত্য যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতার আবির্ভাবের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শান্তি ও সমঝোতা প্রতিষ্ঠা করা, প্রকৃতপক্ষে আমাদের সকল কাজের মূল সেই শিক্ষার মধ্যে নিহিত যা ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এরনিকট আবির্ভূত হয়েছিল।

মহানবী (সা.)-এর যুগের পরবর্তী চৌদ্দশত বছরে, দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর আনীত পবিত্র শিক্ষা মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দীর্ঘদিন ভুলে বসেছিল। তাই প্রকৃত ইসলামের পুনর্জাগরণের উদ্দেশ্যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-কে প্রেরণ করেন। আমি যখন বিশ্বে শান্তি ও সম্প্রীতির প্রসার প্রসঙ্গে ইসলামের শিক্ষার বিষয়ে কথা বলি, তখন আমার অনুরোধ যে, এ বিষয়টি আপনারা আপনাদের দৃষ্টিপটে রাখবেন।

আরো উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, 'শান্তি' ও 'নিরাপত্তার' একাধিক দিক রয়েছে। যেভাবে এর প্রতিটি আঙ্গিক নিজ সত্তায় গুরুত্ব বহন করে, একই সাথে যেভাবে এ আঙ্গিকগুলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত, সেটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, সমাজের শান্তির মূল ভিত্তি পরিবার বা ঘরের শান্তি ও সৌহার্দ্য। ঘরের পরিবেশের প্রভাব ঘরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এর প্রভাব স্থানীয় এলাকার শান্তির উপর পড়ে, যা আবার পর্যায়ক্রমে বৃহত্তর শহর বা নগরীর শান্তির উপর প্রভাব বিস্তার করে। যদি ঘরে অশান্তি থাকে, তবে তা স্থানীয় এলাকার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে এবং তা আবার শহর বা নগরের উপর প্রভাব ফেলবে। একই ভাবে শহর বা নগরীর অবস্থা পুরো দেশের শান্তির উপর প্রভাব ফেলবে এবং শেষ পর্যন্ত জাতির অবস্থা পুরো অঞ্চল বা পুরো বিশ্বের শান্তি ও সম্প্রীতিকে প্রভাবিত করবে। অতএব এটি স্পষ্ট যে, যদি আপনি শান্তির কোন একটি আঙ্গিক নিয়েও আলোচনা করতে চান, তবে তার পরিধি সীমিত থাকবে না, বরং তা ক্রমাগত বিস্তৃত হতে থাকবে। অনুরূপভাবে, আমরা দেখে থাকি যে, যেখানে শান্তির অভাব রয়েছে, সেখানে বিদ্যমান সমস্যা এবং শান্তি ও নিরাপত্তার যে আঙ্গিকটি লংঘিত হয়েছে, তার ভিত্তিতে বিষয়টি সুরাহা করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা প্রয়োজন। এ বিষয় মাথায় রাখলে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ বিষয়গুলোর পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করে এদের বিস্তারিত সমাধান প্রদান করার জন্য আমাদের হাতে যা রয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি সময় প্রয়োজন। তথাপি আমি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার অন্তত কিছু দিক উপস্থাপন করার চেষ্টা করবো।

আধুনিক পৃথিবীতে আমরা লক্ষ্য করি যে, ইসলামের বিরুদ্ধে অনেক আপত্তি উত্থাপন করা হয় এবং বিশ্বে বিদ্যমান বিশৃংখলা ও অস্থিরতার জন্য এ ধর্মকে দায়ী করা হয়। যদিও ইসলাম শব্দটির অর্থই 'শান্তি' ও 'নিরাপত্তা' তবু এরূপ অভিযোগ করা হয়ে থাকে। উপরন্ত, ইসলাম সেই ধর্ম যা শান্তি প্রতিষ্ঠার উপায় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা দিয়েছে এবং এটি অর্জনের জন্য নির্দিষ্ট কতকগুলো বিধি-বিধান প্রদান করেছে। ইসলামের প্রকৃত ও শান্তিপূর্ণ শিক্ষার একটি চিত্র আপনাদের সামনে উপস্থাপনের বিষয়ে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে আমি বিশ্বের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে চাই। আমি নিশ্চিত যে, আপনারা ইতোমধ্যেই এ বিষয়ে সম্যক অবহিত আছেন। তারপরও আমি এর অবতারণা করবো, যেন আমি যখন ইসলামের শান্তি ও সৌহার্দ্যের শিক্ষার আলোচনা করবো তখন আপনাদের দৃষ্টিপটে এ বিষয়গুলো থাকে। আমরা সকলে এ বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন ও স্বীকার করি যে আজকের পৃথিবী এক বিশ্ব পল্লীতে পরিণত হয়েছে, আমরা সকলে নানাভাবে সংযুক্ত, তা আজকের দিনের আধুনিক পরিবহন ব্যবস্থার মাধ্যমেই হোক অথবা মিডিয়া বা ইন্টারনেট বা অন্যান্য বিবিধ মাধ্যমেই হোক। এ সমস্ত কারণে পূর্বের যেকোন সময়ের চেয়ে বর্তমানে বিশ্বের দেশগুলো একে অপরের নিকটবর্তী হয়ে পড়েছে। আমরা দেখি যে, উন্নত দেশগুলোতে সকল গোত্র, ধর্ম ও জাতিসত্তার মানুষ স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেছে এবং একত্রে বসবাস করছে। সত্যিই আজ অনেক দেশে ভিন্ন দেশ হতে এসে অভিবাসন গ্রহণকারী জনসংখ্যা যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। অভিবাসন গ্রহণকারীরা এমনভাবে সমাজের মধ্যে গ্রথিত হয়ে গেছে যে, সরকার বা স্থানীয় জনগণের পক্ষে তাদেরকে সরানো এখন অতীব দুস্কর এমনকি অসম্ভব। যদিও অভিবাসনের সুযোগকে সংকীর্ণ করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা আরোপও করা হয়েছে। তথাপি এমন অনেক উপায় রয়ে গেছে যার মাধ্যমে এক দেশের নাগরিক অন্য দেশে প্রবেশ করতে পারে। বস্তুত অবৈধ অভিবাসনকে যদি বাদও দেওয়া হয়, আমরা দেখি যে কতকগুলো আন্তর্জাতিক আইন বিদ্যমান যা যথার্থ কারণে যারা দেশত্যাগে বাধ্য হয় তাদের সপক্ষে কাজ করে।

আমরা আরো লক্ষ্য করি যে, গণ-অভিবাসনের ফলে কোন কোন দেশে অস্থিরতা ও টানাপোড়েন ছড়িয়ে পড়ছে। এর জন্য উভয় পক্ষই দায়ী – অভিবাসী এবং স্থানীয় জনগণ। একদিকে অভিবাসীগণের একাংশ তাদের নতুন দেশের সমাজের সাথে একাত্ম হতে অস্বীকৃতি জানিয়ে স্থানীয়দের উস্কে দেয়; আর অপরদিকে স্থানীয়দের একাংশের মাঝে সহিষ্ণুতা ও উন্মুক্ত হৃদয়ের অভাব পরিলক্ষিত হয়। সময়ে সময়ে এ ঘৃণা বাড়তে বাড়তে খুবই মারাত্মক পর্যায়ে উপনীত হয়। বিশেষ করে, পাশ্চাত্য জগতে কতক মুসলমানের বিশেষত অভিবাসীগণের নেতিবাচক আচরণের কারণে স্থানীয়দের ঘৃণা ও শত্রুতা অনেক সময় ইসলামের বিরুদ্ধে প্রকাশিত হয়। এ ক্ষোভ এবং প্রতিক্রিয়া কেবল ক্ষুদ্র মাত্রায় সীমিত নয়, বরং চরম পর্যায়ে উপনীত হতে পারে এবং হয়েও থাকে, আর এ কারণেই পাশ্চাত্য নেতৃবর্গ নিয়মিতভাবে এ সমস্যা নিয়ে বক্তব্য রেখে থাকেন। সুতরাং আমরা দেখি যে, কখনো জার্মান চ্যান্সেলর মুসলমানদের জার্মানির সাথে একাত্ম হওয়ার বিষয়ে কথা বলছেন; কখনো বা আমরা দেখি যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী মুসলমানদের সমাজে একাত্ম হওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা বলছেন; আর কোন কোন দেশের নেতৃবৃন্দ তো মুসলমানদের হুঁশিয়ারী পর্যন্ত দিয়েছেন। বিদ্যমান সংঘাতসমূহের ভিতরের অবস্থার গুরুতর অবনতি যদি নাও হয়ে থাকে, অন্তত উদ্বেগজনক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। এ বিষয়গুলো উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারে এবং শান্তিকে বিনষ্ট করার পথে নিয়ে যেতে পারে। এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে এমন সংঘাতের প্রভাব পশ্চিমা জগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং পুরো পৃথিবীর উপর প্রভাব বিস্তার করবে, বিশেষ করে মুসলিম দেশসমূহের উপর এর ফলে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের জগতের মধ্যে সম্পর্কের গুরুতর অবনতি হবে।

অতএব এ পরিস্থিতির উন্নয়ন ও শান্তির বিস্তারের জন্য সকল দলকে একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। সরকারগুলোকে এমন নীতি গ্রহণ করতে হবে যা পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ করে, যেগুলোর মাধ্যমে অন্যের অনুভূতিতে কোন প্রকার আঘাত বা তাদের কোন প্রকার ক্ষতি করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা উচিত।

অভিবাসীদের বিষয়ে বলবো যে, স্থানীয় জনগণের সাথে একাত্ম হওয়ার সদিচ্ছা নিয়েই তাদের দেশে প্রবেশ করতে হবে আর অপরপক্ষে স্থানীয়দের হৃদয় উন্মুক্ত করার জন্য এবং সহনশীলতা প্রদর্শনের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। উপরন্ত মুসলমানদের উপর কেবল কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করলেই তা শান্তির পথে নিয়ে যাবে না, কেননা কেবল এর দ্বারা মানুষের মন-মানসিকতা ও চিন্তাধারার পরিবর্তন করা যায় না। এটি কেবল মুসলমানদের বিষয় না, বরং যখনই কোন ব্যক্তিকে তার ধর্ম বা বিশ্বাসের জন্য জোরপূর্বক অবদমিত করা হয়,

তখন এর এক নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায় যার ফলে শান্তি গুরুতরভাবে বিঘ্নিত হবে। যেমনটি আমি ইতোমধ্যে বলেছি, আমরা লক্ষ্য করি যে, কোন কোন দেশে সংঘাত বাড়ছে, বিশেষ করে স্থানীয় মানুষ এবং মুসলিম অভিবাসীদের মধ্যে। এটা স্পষ্ট যে উভয় পক্ষ ক্রমে ক্রমে পূর্বাপেক্ষা কম সহনশীল হয়ে উঠছে এবং একে অপরকে জানার বিষয়ে একরূপ অনীহা রয়েছে। ইউরোপীয় নেতৃবর্গকে এটা মেনে নিতে হবে যে, এটিই বাস্তবতা এবং উপলব্ধী করতে হবে যে, পারস্পরিক ধর্মীয় শ্রদ্ধা ও সহিষ্ণুতা প্রতিষ্ঠায় তাদের একটি দায়িত্ব রয়েছে। এটি অত্যাবশ্যকীয়, যেন প্রত্যেক ইউরোপীয় দেশের অভ্যন্তরে এবং ইউরোপীয় ও মুসলমান দেশসমূহের মাঝে সৌহার্দ্যের এক পরিবেশ গড়ে ওঠে এবং বিশ্বের শান্তি যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ না হয়।

আমি বিশ্বাস করি যে, এসব সংঘাত ও বিভক্তির কারণ কেবল ধর্ম বা বিশ্বাস নয় এবং এটি কেবল পাশ্চাত্য ও মুসলমান দেশসমূহের পার্থক্যের প্রশ্ন নয়। প্রকৃতপক্ষে এ বিরোধের গোড়ার কারণের মধ্যে বড় একটি হল বিশ্বজনীন অর্থনৈতিক সংকট। যখন কোন মন্দা বা ঋণ সংকট (ক্রেডিট ক্রাঞ্চ) ছিল না তখন কোন দিন কেউ অভিবাসীদের আগমন নিয়ে পরোয়া করে নি; মুসলিম হোক বা অমুসলিম বা আফ্রিকান। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি ভিন্ন, আর সে কারণেই এসব হচ্ছে, এটি এমনকি ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ককেও প্রভাবিত করেছে এবং এর ফলে কতক ইউরোপীয় জাতির মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ও তিক্ততা দিন দিন বেড়ে চলেছে। সর্বত্র নৈরাশ্যের অবস্থা দৃশ্যমান হচ্ছে।

ইউরোপীয় দেশগুলোর একটি মহান অর্জন হল ইউরোপীয় ইউনিয়ন গঠন করা, কেননা এর মাধ্যমে মহাদেশটি একতাবদ্ধ হয়েছে। অতএব, আপনাদের উচিত হবে এ একতাকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে একে অপরের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে সকল প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। সাধারণ জনগণের মনে বিদ্যমান উৎকণ্ঠা ও ভীতিসমূহকে অবশ্যই দূর করতে হবে। একে অপরের সমাজকে রক্ষার খাতিরে আপনাদের উচিত হবে একে অপরের যৌক্তিক ও ন্যায়সঙ্গত দাবিসমূহ মেনে নেওয়া আর অবশ্যই প্রতিটি দেশের জনগণের কেবল যৌক্তিক এবং ন্যায়সঙ্গত দাবিই উত্থাপন করা উচিত।

স্মরণ রাখবেন যে, ইউরোপের শক্তি এর একতাবদ্ধ ও একত্রে এক হয়ে থাকার মধ্যে নিহিত। এরূপ একতা কেবল এখানে ইউরোপে আপনাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে না, বরং বৈশ্বিক পর্যায়ে এ মহাদেশের শক্তি ও প্রভাব বজায় রাখার কারণ হবে। বস্তুত ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে কথা বলতে গেলে, আমাদের প্রচেষ্টা এই হওয়া উচিত যে পুরো পৃথিবী যেন একতাবদ্ধ হয়। মুদ্রার দিক থেকে বিশ্বের একতাবদ্ধ হওয়া উচিত। মুক্ত ব্যবসা ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশ্বের একতাবদ্ধ হওয়া উচিত আরও অভিবাসনের বিষয়ে সুসংহত ও বাস্তবমুখী নীতিসমূহ গড়ে তোলা উচিত, যেন বিশ্ব একতাবদ্ধ হতে পারে। সারকথা হল এই যে, সকল দেশের একে অপরের সাথে সহযোগিতা করা উচিত যেন বিভক্তির স্থলে একতা প্রতিষ্ঠিত হয়। যদি এ ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা হয়, তবে শীঘ্রই দেখা যাবে যে, বিদ্যমান সংঘাতসমূহের অবসান হবে এবং এর স্থলে শান্তি ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিত হবে, এ শর্তসাপেক্ষে যে, প্রকৃত ন্যায়ের চর্চা করা হয় এবং প্রত্যেক দেশ নিজ দায়িত্ব উপলব্ধি করে। আমাকে গভীর অনুতাপের সাথে বলতে হচ্ছে যে, যদিও এটি একটি ইসলামী শিক্ষা, ইসলামী দেশগুলো নিজেদের মধ্যে একতা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় নি। যদি তারা একে অপরের সহযোগিতা করতো এবং একতাবদ্ধ হত, তবে তাদেরকে নিজেদের আভ্যন্তরীণ সমস্যাসমূহ ও চাহিদা পূরণে সর্বদা পশ্চিমা সাহায্যের মুখাপেক্ষী হতে হত না।

এ কথাগুলোর সাথে আমি এখন বিশ্বে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষাসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করবো। প্রথমত ইসলামের অন্যতম মৌলিক ও প্রাথমিক একটি শিক্ষা এই যে একজন প্রকৃত মুসলিম সেই ব্যক্তি যার কথা ও কাজ থেকে অপর সকল শান্তিকামী মানুষ নিরাপদ থাকে। এটি একজন মুসলমানের সেই সংজ্ঞা যা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রদান করেছেন। এ মৌলিক ও অনুপম সুন্দর নীতি শোনার পরে ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযোগ বা আপত্তি উত্থাপনের আর কোন অবকাশ থাকে কি? নিশ্চয় না। ইসলাম শিক্ষা দেয় যে, কেবলমাত্র যারা নিজ কথা ও কাজে অন্যায় ও বিদ্বেষ ছড়ায় তারাই শান্তি প্রদানের যোগ্য। এভাবে, স্থানীয় পর্যায় থেকে বৈশ্বিক পর্যায়ে যদি সকল পক্ষ এ স্বর্ণালী নীতির গণ্ডির মধ্যে থাকে, তাহলে আমরা দেখবো যে কখনো ধর্মীয় বিশৃংখলার উদ্ভব হবে না। কখনো রাজনৈতিক অস্থিরতার উদ্ভব হবে না আর লালসা ও ক্ষমতালিপ্সা থেকে উদ্ভূত বিশৃংখলাও সৃষ্টি হবে না। যদি এ প্রকৃত ইসলামী নীতিসমূহ অনুসরণ করা হয়, তাহলে দেশগুলোর অভ্যন্তরে জনসাধারণ একে অপরের অধিকার ও অনুভূতির বিষয়ে যত্নবান হবে এবং সরকারগুলো সকল নাগরিককে রক্ষায় তাদের দায়িত্ব পালন করবে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রত্যেক রাষ্ট্র একে অপরের সাথে প্রকৃত সৌহার্দ ও সহানুভূতির স্পৃহা নিয়ে সমবেতভাবে কাজ করবে।

আরেকটি মূলনীতি যা ইসলাম শেখায় তা এই যে, শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে, এটা আবশ্যক যে সকল পক্ষ সর্বদা কোন প্রকারের দম্ভ বা অহমিকা প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকে। মহানবী (সা.) তার একটি বিখ্যাত উক্তিতে এ বিষয়টিই উপস্থাপন করেছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন যে, কোন শ্বেতাঙ্গের উপর কোন কৃষ্ণাঙ্গের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই এবং কোন কৃষ্ণাঙ্গের উপরও কোন শ্বেতাঙ্গের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তেমনি অন্য কোন জাতির উপর কোন ইউরোপীয় ব্যক্তির কোন মহত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব নেই, আর না আফ্রিকান বা এশীয় বা বিশ্বের অন্য কোন অংশের মানুষের। জাতি, বর্ণ ও গোত্রের এ বৈচিত্র্য কেবল আমাদের পরিচিত ও সনাক্তকরণের একটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

সত্য এই যে, আধুনিক বিশ্বে আমরা সকলে একে অপরের উপর নির্ভরশীল। আজ এমনকি ইউরোপ বা যুক্তরাষ্ট্রের মত বৃহৎ শক্তিগুলো অন্যদের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থেকে টিকে থাকতে পারবে না। আফ্রিকান দেশগুলো বিচ্ছিন্ন থেকে সমৃদ্ধি লাভের আশা করতে পারে না, আর এশীয় দেশগুলোর পক্ষেও বিশ্বের কোন অংশের দেশ বা জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে আপনার সাদরে স্বাগত জানাতে হবে। গত কয়েক বছরের ইউরোপের তথা বিশ্বের অর্থনৈতিক সংকট যেভাবে কম-বেশি বিশ্বের প্রত্যেকটি দেশকে নেতিবাচক ভাবে প্রভাবিত করেছে তা থেকে বিশ্ব আজ কিভাবে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কযুক্ত তা স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। তদুপরি বিজ্ঞানে অগ্রগতির জন্য বা অন্য কোন দক্ষতায় উন্নতি করার জন্য দেশগুলোর একে অপরের সাহায্য সহযোগিতার আবশ্যকতা রয়েছে।

আমাদের সব সময় স্মরণ রাখতে হবে যে, এ পৃথিবীর মানুষকে, তারা আফ্রিকা, ইউরোপ, এশিয়া বা অন্য কোন স্থান থেকে আসুন না কোন, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ অসাধারণ মেধাগত যোগ্যতাসমূহ প্রদান করেছেন। যদি সকল পক্ষ তাদের নিজ নিজ খোদা-প্রদত্ত যোগ্যতাসমূহ যথাসাধ্য বিশ্ব মানবতার উন্নতি কল্পে প্রয়োগ করে, তাহলে আমরা দেখবো যে, বিশ্ব এক শান্তির নীড়ে পরিণত হয়েছে। কিন্তু যদি উন্নত দেশগুলো স্বল্পোন্নত, বা উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নতি-অগ্রগতিকে দমন করতে চায় আর সে সব দেশের উর্বর ও মেধাবী মস্তিষ্কের ব্যক্তিদের সুযোগ না দেয়, তাহলে সন্দেহ নাই যে, অস্থিরতা বিস্তার লাভ করবে এবং এর ফলে সৃষ্ট অস্থিতিশীলতা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তাকে বিনষ্ট করবে।

শান্তির প্রসারে ইসলামের আরেকটি নীতি হল অন্যের প্রতি কোন অন্যায়-অবিচার বা তাদের কোন অধিকার হরণ হলে, আমাদের তা সহ্য করা উচিত না। ঠিক যেভাবে আমরা আমাদের নিজেদের অধিকারের হরণ মেনে নিই না, অন্যদের ক্ষেত্রেও এটি আমাদের মেনে নিতে প্রস্তুত থাকা উচিত না। ইসলাম শিক্ষা দেয় যে, যখন প্রতিশোধ গ্রহণ অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে, তখন তা প্রথম সীমালঙ্ঘনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। কিন্তু যদি ক্ষমা প্রদর্শনের ফলে সংশোধনের অবকাশ থাকে তবে ক্ষমার পথটি বেছে নেওয়া উচিত। প্রকৃত এবং সবচেয়ে অগ্রগণ্য উদ্দেশ্য সব সময় হওয়া উচিত সংশোধন, সমঝোতা ও দীর্ঘস্থায়ী শান্তির প্রতিষ্ঠা। অথচ বাস্তবে আজ কী ঘটছে? যদি কেউ কোন ভুল বা অন্যায় করে থাকে, তাহলে আক্রান্ত পক্ষ এমনভাবে প্রতিশোধ নিতে চায় যা সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যের উর্ধ্বে এবং যা মূল সংঘটিত অন্যায়ের চাইতে অনেক গুরুতর।

আজ ঠিক এ বিষয়টিই ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের মধ্যে ঘনায়মান সংঘাতের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বড় শক্তিগুলো সিরিয়া, লিবিয়া বা মিশরের পরিস্থিতি নিয়ে খোলাখুলিভাবে তাদের ক্ষোভ ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে; যদিও এ বিতর্ক করা যায় যে এগুলো মূলত ছিল তাদের আভ্যন্তরীণ সমস্যা অথচ তাদেরকে (বৃহৎ শক্তিগুলোকে) ফিলিস্তিনি জনগণের বিষয়ে উদ্বিগ্ন বা অন্তত তেমনভাবে উদ্বিগ্ন মনে হয় না। এই ডবল স্ট্যান্ডার্ড বা দ্বৈত আচরণের উপলব্ধি মুসলমান দেশগুলোর জনগণের অন্তরে বৃহৎ শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও বিদ্বেষের কারণ হচ্ছে। এ ক্রোধ এবং বিদ্বেষ অত্যন্ত ভয়াবহ এবং যে কোন মুহূর্তে এটি উপচে পড়ে বিস্ফোরিত হতে পারে। তার ফলাফল কি হবে? উন্নয়নশীল বিশ্বে কতটুকু ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হবে? তারা নিজ অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারবে? উন্নত দেশগুলো কতটা প্রভাবিত হবে? কেবলমাত্র খোদাই এরূপ প্রশ্নের উত্তর

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক বদর কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-9 Thursday, 22 Aug, 2024 Issue No.34

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

জানেন। আমি এর উত্তর দিতে পারি না। আর কেউ এর উত্তর দিতে পারে না। যেটুকু আমরা নিশ্চিত থাকতে পারি তা এই যে বিশ্বের শান্তি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

এটা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন যে, আমি কোন নির্দিষ্ট একক দেশের অনুকূলে বা পক্ষে কথা বলছি না। আমি যা বলতে চাই তা হল, সকল প্রকার নিষ্ঠুরতা, তার অস্তিত্ব যেখানেই হোক না কেন, নির্মূল করতে হবে তা ফিলিস্তিনিদের দ্বারা সংঘটিত হোক না কেন, বা ইসরায়েলিদের বা অপর কোন দেশের মানুষের দ্বারা। নিষ্ঠুরতাসমূহকে অবশ্যই বন্ধ করতে হবে, কেননা যদি এগুলোকে ছড়ানোর সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে সারা পৃথিবীতে ঘৃণার আগুন এভাবে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে যে, মানুষ অচিরেই বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটজনিত সমস্যাবলীকে ভুলে যাবে। এর চাইতে বহুগুণ ভীতিপ্রদ এক পরিস্থিতির তারা মুখোমুখি হবে। এত বড় সংখ্যায় প্রাণহানি হবে যে, আমরা তা চিন্তা বা কল্পনাও করতে পারি না।

সুতরাং এটি ইউরোপীয় দেশগুলো, যারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভয়াবহ ক্ষতির শিকার হয়েছে, তাদের দায়িত্ব যে, তারা তাদের অতীত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং বিশ্বকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে। এতদুদ্দেশ্যে তাদেরকে ন্যায়ের দাবি পূরণ করতে হবে এবং তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করতে আন্তরিক হতে হবে। ইসলাম সবসময় ন্যায়সঙ্গত ও পক্ষপাতহীন আচরণের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়। এটি শিক্ষা দেয় যে, কোন পক্ষকেই বৈষম্যমূলক সুবিধা বা অন্যায় সুযোগ দেওয়া উচিত না। এমন হওয়া উচিত যে, অন্যায়কারী জানবে যে, যদি কোন দেশের প্রতি সে অন্যায় পদক্ষেপ গ্রহণে উদ্যত হয়, সেই দেশের আকার বা মর্যাদা নির্বিশেষে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় তাকে তা করতে দিবে না। যদি জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহ, ইউরোপীয় ইউনিয়নের সুবিধা ভোগকারী রাষ্ট্রসমূহ এবং ঐ সকল দেশ যা বৃহৎ শক্তিগুলোর, এমনকি উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর প্রভাবাধীন রয়েছে সকলে যদি এ নীতি অবলম্বন করে তবে এবং কেবল তখনই শান্তির উদ্ভব হতে পারে।

উপরন্তু কেবল যদি ঐ সকল রাষ্ট্র, যারা জাতিসংঘে ভেটো প্রদানের অধিকার রাখে, যদি অনুধাবন করে যে তাদের আচরণের দায়ভার তাদেরকে নিতে হবে, তবেই প্রকৃত অর্থে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। বরং আমি আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলবো যে, ভেটো প্রদানের অধিকার কখনো শান্তি প্রতিষ্ঠার সুযোগ দিতে বা এর পথকে সুগম করতে পারে না। কেননা স্পষ্টতই সকল দেশের মর্যাদা সমান নয়। ইতিপূর্বে এ বছর যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাপিটল হিলে নেতৃস্থানীয় রাজনীতিবিদ ও নীতি নির্ধারকদের উদ্দেশ্য বক্তব্য প্রদান কালেও আমি এ বিষয়টি চিহ্নিত করেছি। যদি আমরা জাতিসংঘের ভোট প্রদানের ইতিহাসের দিকে তাকাই তবে আমরা দেখি যে, ভেটো ক্ষমতা যে সব সময় অত্যাচারিতকে বা যারা ন্যায়সঙ্গত আচরণ করছে তাদের সাহায্য করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে এমনটি নয়। বস্তুত আমরা দেখেছি যে, কতক সময়ে ভেটো ক্ষমতার অপব্যবহার করে নিষ্ঠুরতাকে প্রতিহত করার বদলে সাহায্য সমর্থন করা হয়েছে। এটি কোন গোপন বা অজানা বিষয় নয়; অনেক বিশ্লেষক এ বিষয়ে খোলাখুলি লিখে বা বলে থাকেন।

আরেকটি সুন্দর নীতি যা ইসলাম শেখায় তা এই যে, সমাজে শান্তির জন্য সততা ও ন্যায়বিচারের নীতির উপর ক্রোধকে প্রাধান্য লাভের সুযোগ না দিয়ে প্রত্যেকের জন্য আবশ্যক, একে দমন করা। ইসলামের সূচনা লগ্নের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, প্রকৃত মুসলমানগণ সদা এ নীতির উপর চলেছেন; আর যিনি এমনটি করেন নি তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কর্তৃক তিরস্কৃত হয়েছেন। তথাপি, আজ দুর্ভাগ্যক্রমে সব সময় এ চিত্র পরিলক্ষিত হয় না। এমন ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে সেনা বাহিনীসমূহ বা সৈন্যরা, যাদেরকে শান্তি প্রতিষ্ঠায় মোতায়েন করা হয়, এমন আচরণ করে থাকেন যা তাদের ঘোষিত লক্ষ্যের সাথে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক। উদাহরণস্বরূপ কোন কোন দেশে বিদেশী সৈন্যরা তাদের হাতে নিহতদের মরদেহের সাথে অত্যন্ত অসম্মানজনক ও বীভৎস আচরণ করেছে। এভাবে কি শান্তি স্থাপিত হতে পারে? এরূপ আচরণের প্রতিক্রিয়া কেবল আক্রান্ত দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না, বরং বিশ্ব জুড়ে প্রকাশিত হয়। মুসলিম চরমপন্থীরা এর সুযোগ নেয় এবং বিশ্বের শান্তি চূর্ণ বিচূর্ণ হয়। যদিও এ (প্রতিক্রিয়া) ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী।

ইসলাম শেখায় যে শান্তি কেবল তখনই প্রতিষ্ঠা সম্ভব যখন অত্যাচারিত এবং অত্যাচারী উভয়কে এমনভাবে সহায়তা করা হয় যা সম্পূর্ণ পক্ষপাতমুক্ত, গোপন স্বার্থ বর্জিত এবং সকল প্রকার শত্রুভাবাপন্নতা থেকে মুক্ত। শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় সকল পক্ষকে সমান অবস্থান এবং অধিকার প্রদান করার মাধ্যমে।

যেহেতু সময় সীমিত, আমি আর মাত্র একটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই, আর তা এই যে, ইসলাম এ শিক্ষা দেয় যে, অন্যের ধন সম্পদের দিকে ঈর্ষাকাতর দৃষ্টিতে দেখা উচিত না। যা অন্যের তার প্রতি তোমাদের লোভাতুর অনুভূতি থাকা উচিত নয়, কেননা এটিও শান্তি পদদলিত হওয়ার অন্যতম কারণ। যদি সম্পদশালী দেশগুলো স্বল্পোন্নত দেশসমূহের ধন-সম্পদ তাদের (ধনী দেশগুলোর) নিজ প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে আহরণ ও ব্যবহার করতে চায়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই, অস্থিতিশীলতা ছড়িয়ে পড়বে। যেখানে যথাযথ উন্নত দেশগুলো তাদের সেবার বিনিময়ে একটি ছোট ও ন্যায়সঙ্গত ও অংশ তাদের নিজ চাহিদা পূরণের জন্য নিতে পারে, কিন্তু সম্পদের সিংহভাগ এ সকল অনুন্নত দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের সহায়তাকল্পে ব্যবহৃত হওয়া উচিত। তাদেরকে সমৃদ্ধি অর্জনের সুযোগ দেওয়া উচিত এবং উন্নত বিশ্বের সমমানের উন্নীত হওয়ার প্রয়াসে তাদের সহযোগিতা করা উচিত, কেননা তখনই, এবং কেবল তখনই শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। যদি সেসব দেশের শাসকগণ সৎ না হয়ে থাকে, তবে পাশ্চাত্য বা উন্নত দেশগুলোর উচিত সাহায্য প্রদান করে স্বয়ং সেই দেশের উন্নয়নের তদারকী ও তত্ত্বাবধান করা।আরো অসংখ্য বিষয় আছে যেগুলো আমি আলোচনা করতে পারতাম, কিন্তু সময়ের সীমাবদ্ধতার দিকে দৃষ্টি রেখে যেটুকু উল্লেখ করেছি তার মধ্যেই আমি নিজেকে সীমিত রাখবো। নিশ্চিতভাবে আমি যা কিছু বর্ণনা করেছি তাই ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার প্রতিনিধিত্ব করে।একটি প্রশ্ন আপনাদের হৃদয়ে উত্থিত হতে পারে আর তাই আমি আগেই তার উত্তর দিয়ে দিই। আপনারা বলতে পারেন যে, যদি এগুলোই ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা হয়ে থাকে, তাহলে মুসলিম বিশ্বে আমরা কেন এত বিভেদ ও বিশৃংখলা দেখে থাকি? এর উত্তর আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি একজন সংস্কারকের আবির্ভাবের প্রয়োজনীয়তার কথা বলে, যাকে আমরা আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বলে বিশ্বাস করি। আমরা আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সর্বদা যত দূর সম্ভব বিস্তৃত পরিসরে এ প্রকৃত শিক্ষাকে ছড়িয়ে দিতে সচেষ্ট হয়েছি। আমি আপনাদের সকলকে অনুরোধ করতে চাই যে, আপনারা আপনাদের নিজস্ব পরিমণ্ডলেও এ বিষয়গুলো সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়াসী হবেন, যেন বিশ্বের সকল অংশে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

যদি আমরা এ কাজে ব্যর্থ হই, তবে পৃথিবীর কোন অংশ যুদ্ধের ভয়াবহ সর্বনাশা প্রভাব থেকে নিরাপদ থাকবে না। আমি দোয়া করি যেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ পৃথিবীর মানুষকে, বিশ্বকে অনাগত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার প্রয়াসে তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ ও আকাঙ্ক্ষার উর্ধ্বে ওঠার সৌভাগ্য দান করেন। আজকের বিশ্বে পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলো সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী, আর তাই আজ অন্যান্যদের পূর্বে এটি আপনাদের দায়িত্ব যে, সংকটাপন্ন গুরুত্ববাহী এ বিষয়গুলোর প্রতি আপনাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করবেন।

পরিশেষে আমি আপনাদের সবাইকে আমার বক্তব্য শুনতে সময় বের করে এখানে আসার জন্য আরেকবার ধন্যবাদ দিতে চাই। আল্লাহ্ আপনাদের মঙ্গল করুন। আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ।

যুগ ইমামের বাণী

স্মরণ রেখো! কাজ তারাই করতে পারে, অর্থাৎ ধর্মের সেবা তারাই করতে পারে যাদের মধ্যে স্বর্গীয় জ্যোতি বিদ্যমান।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৩)

দোয়াপ্রার্থী: **Jahanara Begum, Bhagbangola, (Murshidabad)**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir